জেলে ত্রিশ বছর

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
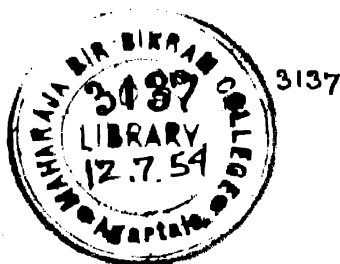
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী

কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

মূল্য—তিন টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫৪

ভূমিকা

'জেলে ত্রিশ বছর' প্রকাশিত হইল। আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা কিছুটা ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তবে, তাহা আমার জীবন-কথা বলিয়া নহে, আমাদের সমষ্টিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার স্বরূপটি যাহাতে দেশবাসী বুঝিতে পারেন—তাহারই জন্য।

অনুশীলন সমিতির সঙ্গে প্রথমাবধি নিবিড়ভাবে জড়িত হই। এই সমিতির কথা তাই আমার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। বাঙ্গালা দেশে অপর বিপ্লব সমিতিও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্যতম ব্যক্তি উহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিবেন, কেহ কেহ করিয়াছেন। আমার পুস্তক জেলে লেখায় এবং বাহিরে আসিয়া নানা কাজে ব্যস্ত থাকায়, বিপ্লব যুগের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে পারি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তৃত ইতিহাস লেখার ইচ্ছা রহিল।

এই পুস্তক প্রকাশে শ্রদ্ধেয় ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন সেন, প্রফেসার বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, প্রসিদ্ধ শিল্পী কান্তি সেন ও শ্রীমান হরেন্দ্রনাথ রায়ের সাহায্য পাইয়াছি। এই সকল বন্ধুবর্গের উৎসাহ ও সহায়তা না পাইলে পুস্তক প্রকাশ করা আমার দ্বারা সম্ভবপর হইত না।

২৭শে অগ্রহায়ণ
১৩৫৪ সন।
কলিকাতা।

নিবেদক
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন,
বীরত্ব দেখাইয়াছেন, অত্যাচার নির্যাতন ভোগ
করিয়াছেন, দেশবাসী যাঁহাদের নাম জানেনা,
সেইসব অজ্ঞাতনামা বীর দেশপ্রেমিকদের
উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা
উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু

নে[illegible]জী সুভাষচন্দ্র

প্রস্তাবনা

আমার জীবন সফল হয় নাই। সাধারণতঃ সফল জীবন বলিতে লোকে যাহা মনে করে,—অর্থাৎ অর্থ উপার্জন, গৃহধর্ম পালন, রাজ সম্মান লাভ, —তাহা আমার ভাগ্যে হয় নাই বলিয়া আমি জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, মনে করি না; বস্তুতঃ, একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয় নাই, আমার জীবন সফল হইয়াছে—সার্থক হইয়াছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া জীবন প্রভাতে ঘরের বাহির হইয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হয় নাই—আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারি নাই। আমার যৌবনে যখন আমার ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, ডাণ্ডা বেড়ী পায়, ক্ষুদ্র নির্জনকক্ষে দিন রাত্রি যখন আমি আবদ্ধ, তখনও মনে করি নাই আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনও আমার মনে এই ধারণাই ছিল যে ১৫ বৎসর আর কত দিন, দেখিতে দেখিতে পনের বৎসর কাটিয়া যাইবেই। ইতিমধ্যে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয়, আমি জেল হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিব।

আমার স্বপ্ন সফল হয় নাই,—আমি সফলকাম বিপ্লবী নই। আমার ব্যর্থতার কারণ, আমার দুর্বলতা নয়। আমি কখনও ভীরু ছিলাম না—আমার জীবনে কখনও দুর্বলতা দেখাই নাই। আমি আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। অর্থ লোভ আমার ছিল না। এক সময় হাজার হাজার টাকা আমার হাতে আসিয়াছে, কিন্তু সে টাকা নিজের ভোগ বিলাসিতার জন্য ব্যয় করি নাই। সেই সময়ও আমি রাস্তাঘাটে চলা ফিরার সময় চিড়া মুড়ি খাইয়াছি, যতটা সম্ভব পায়ে হাঁটিয়াই চলিয়াছি—গাড়ী ঘোড়া চড়ি নাই। মৃত্যুভয় আমার ছিল না, কোন দুঃসাহসিক কার্যে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমি কখনও

অলস ছিলাম না, কঠিন পরিশ্রমের কাজে কখনও ভীত হই নাই, যখন যে কাজ করিয়াছি, আন্তরিকতার সহিতই করিয়াছি। আমার ব্যর্থতার কারণ পারিপার্শিক অবস্থা, আমার ব্যর্থতার কারণ একজন দক্ষ বিপ্লবীর যতটা ধীশক্তি ও বিচক্ষণতা থাকা আবশ্যক তাহার অভাব।

আমার পিতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। আমি ভাইদের মধ্যে ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। আমার পড়ার খরচের কোন অভাব ছিল না। আমি ছাত্রও খারাপ ছিলাম না—ভাল ছাত্রের মধ্যেই গণ্য ছিলাম। তথাপি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী লাভ করিতে পারি নাই। আমার শৈশবে ১৯০২।৩ সনে যখন আমি মালদহ জিলার অন্তর্গত কাণসাট ছিলাম এবং পুখুরিয়া মাইনর স্কুলে পড়িতাম তখন সেখানে স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের স্নেহের পাত্র ছিলাম এবং ক্লাসে প্রথম হইতাম। আমার শিক্ষক মহাশয়গণ আশা করিতেন আমি বৃত্তি পাইব। কিন্তু বৃত্তি পাওয়া আমার হয় নাই। মাইনর পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই আমাকে কাণসাট পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয় এবং আমি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হই।

ময়মনসিংহের ধলা হাই স্কুলে আমি এক বৎসর ছিলাম এবং সেখানেও ভাল ছাত্রের মধ্যেই গণ্য ছিলাম। পর বৎসর আমি সাটিরপাড়া হাইস্কুলে ভর্তি হই এবং স্কুল বোর্ডিংএ থাকি। আমি সাটিরপাড়া স্কুলে প্রথম দ্বিতীয় স্থানই অধিকার করিতাম। একবার একটি ঘটনা ঘটে। আমি যখন থার্ড ক্লাস হইতে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠি, সেই বৎসর সংস্কৃতের প্রশ্ন খুব কঠিন হইয়াছিল। সংস্কৃতে মাত্র একজন ছাত্র পাশ করিয়াছিল। আমি কয়েক নম্বরের জন্য ফেল করিয়াছিলাম, কিন্তু মোটের উপর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। সকল ছাত্রকেই কিছু গ্রেস্ দিয়া প্রমোশন দেওয়া হইয়াছিল। আমি প্রমোশনের দিন উপস্থিত ছিলাম না, সমিতির কাজে অন্যত্র ছিলাম, আমাকে প্রমোশন দেওয়া হয় নাই। আমি বোর্ডিংএ উপস্থিত হইয়া যখন শুনিতে পাইলাম আমি প্রমোশন পাই নাই, তখন বলিতে লাগিলাম, আমি আর পড়িব না—ঢাকা-সমিতির বোর্ডিংএ চলিয়া যাইব এবং সমিতির

কাজ করিব। আমার শিক্ষক মহাশয়গণ আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। আমার মন্তব্য শুনিয়া তাঁহারা আমাকে ডাকাইলেন। আমি উপস্থিত হইলে, আমাদের তৃতীয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শীতল চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে স্নেহভরে বলিলেন—তুমি প্রমোশন নিশ্চয়ই পাইবে, কিন্তু তোমার নিকট হইতে আমরা এই প্রতিশ্রুতি চাই,—তুমি সমিতির কাজের জন্য যতক্ষণ সময় ব্যয় কর, পড়াশুনার জন্যও ততক্ষণ সময় দিতে হইবে—তোমার সকালে দুই ঘণ্টা ও রাত্রে এক ঘণ্টা পড়াশুনা করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, দেশ যেমন তোমাকে চায়, আমরাও তোমার দিকে চাহিয়া আছি। আমাদের স্কুল হইতে এপর্যন্ত কেহ স্কলারশিপ পায় নাই। তুমি যদি প্রত্যহ তিন ঘণ্টা পড় তবে আমাদের বিশ্বাস তুমি স্কলারশিপ পাইবে। আমি শিক্ষক মহাশয়দের কথায় সম্মত হইলাম এবং আমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু স্কলারশিপ পাওয়া আমার অদৃষ্টে ছিল না—। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই ১৯০৮ সনের মধ্যভাগে নারায়ণগঞ্জে ধৃত হই এবং আমার ছয়মাস জেল হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যজীবন শেষ হইয়া নূতন জীবন আরম্ভ হয়।

কারা জীবন হইতেই আমার নূতন জীবন আরম্ভ হয় এবং সম্ভবতঃ কারাগারেই আমার জীবনের শেষ হইবে। আমি ভারতবর্ষের মধ্যে, ভারতবর্ষ কেন সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে, রাজনৈতিক কারণে সর্বাপেক্ষা অধিক বৎসর যাঁহারা কারাগারে কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম। আমি ১৯০৮ সন হইতে এপর্যন্ত ৩০ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, ৪।৫ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছি; ১৯১৬।১৭ সনে আন্দামানে বারিনবাবু, পুলিনবাবু, সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, ভাই পরমানন্দ, জোয়ালা সিং, পৃথ্বি সিং, গুরুমুখ সিং, পণ্ডিত পরমানন্দ, মোস্তাফা আমেদ প্রভৃতির সহিত একত্র ছিলাম। ১৯২৫।২৬ সনে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয় জেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাটাইয়াছি, ১৯৩২।৩৩ সনে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলে কে, রামন মেনন, কর্ণাটকের সদাশিব রাও, অধ্যাপক এন, জি, রঙ্গ,

মালাবার বিদ্রোহের নেতা এম, পি, নারায়ণ মেনন প্রভৃতির সহিত একত্র ছিলাম। বাঙ্গালা দেশের ছয়টি সেণ্ট্রাল জেলে এবং কয়েকটি ডিষ্ট্রিক্ট জেলেও ছিলাম। আমি বহু বৎসর সাধারণ কয়েদীর মত ছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম এবং বিশেষ শ্রেণীর (Special Class) কয়েদী ছিলাম। আমি ষ্টেট প্রিজনার ছিলাম, ডেটিনিউ ছিলাম, সিকিউরিটি বন্দী ছিলাম এবং অন্তরীণাবদ্ধও ছিলাম। জেলখানার পেনাল কোডে যে সব শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যে-সব শাস্তির কথা লেখা নাই, তাহার প্রায় সবগুলি সাজাই ভোগ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ জেলে বেশীর ভাগ সময় অসহ্য উৎপীড়নে জীবনের ত্রিশ বৎসর আমার কাটিয়াছে, জেলে এবং জেলের বাহিরে ৫৮ বৎসর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু দেশ আজ পর্যন্তও স্বাধীন হইল না। তাই বলিতেছিলাম, আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। আজ দমদম জেলে বসিয়া এই ব্যর্থ জীবনের কথা মনে করিয়া তাহারই কাহিনী লিখিয়া যাইতেছি। আমাদের জীবনে একদিন যে জোয়ার আসিয়াছিল, তাহা আমাদের কত ঘাটে ঘুরাইয়াছে, তাহারই ইতিহাস স্মরণ করিয়া এবং লিপিবদ্ধ করিয়া জেলের একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বদেশী আন্দোলন এবং তাহাতে যোগদান

১৯০৫ সনে বাঙ্গালাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম হয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সমগ্র বাঙ্গালাদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, সেই বন্যায় আমার ক্ষুদ্র জীবনতরীখানাও ভাসিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার যুবক, বৃদ্ধ, জমিদার, কৃষক সকলেই স্বদেশ প্রেমে মাতিয়া উঠে, সকলের মনেই নূতন উৎসাহ—আমরা স্বাধীনতা চাই, বৃটিশের অধীনে থাকিব না। স্বদেশী আন্দোলনের নেতাগণ নির্দেশ দিয়াছেন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিতে হইবে, দেশের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ কল্পে দেশের সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা হইতে লাগিল, হাটে-বাজারে পিকেটিং চলিতে লাগিল। আমি তখন ধলা স্কুলে পড়ি এবং স্কুল বোর্ডিংএ থাকি। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ধলায় আসিয়া পৌছিল, জমিদার বাড়ীতে তাঁত চরকা বসিল, সভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং চলিতে লাগিল—"বন্দেমাতরম, আল্লাহো আকবর, ভারতমাতা কী জয়" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যুবকের দল ডন, কুস্তি, কুচ-কাওয়াজ করিতে লাগিল—লোকের মনে কি উৎসাহ! ধলাতে যাহারা আন্দোলনে মাতিয়াছিল আমি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম।

একদিন দেখিলাম বাড়ী হইতে আমার নামে একটা পার্শেল আসিয়াছে। কিসের পার্শেল বুঝিতে পারি নাই, আমার নামে কোন পার্শেল আসার কথা ছিল না; আমি মনে করিলাম, এখানে খাওয়ার বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, এজন্য বাড়ী হইতে কিছু খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়াছে। তাড়াতাড়ি পার্শেল খুলিয়া দেখিলাম একজোড়া দেশী মোটা কাপড়। আমার কাপড়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, আমার জামা কাপড় ক্রয় করার জন্য বাড়ী হইতে টাকা আসিত, আমি

আমার পছন্দমত জামা কাপড় ক্রয় করিতাম। পার্শেল পাঠাইয়াছিলেন আমার পিতা। তিনি সম্ভবতঃ চাহিয়াছিলেন তাঁহার স্নেহের কনিষ্ঠ পুত্র স্বদেশ প্রেমিক হউক। তাই তিনি তাহাকে দেশী বেশভূষায় সজ্জিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন, হয়ত তিনি এই জন্যই পাঠাইয়াছিলেন একজোড়া দেশী মোটা কাপড়। এই কাপড়ের মধ্য দিয়াই তিনি পাঠাইয়াছিলেন তাঁর আশীর্বাদ—আমি তাহা মাথা পাতিয়া লইলাম।

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামেও পৌছিয়াছিল। আমার পিতা আমাদের বাড়ীতে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করেন। তিনি দেশী কাপড় ও দেশী নুন প্রচলন করেন। সেই সময় হইতে আমাদের বাড়ীতে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী নুন আর প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমাদের কাপাসাটিয়া গ্রামে (ময়মনসিংহ) যে কয়ঘর লোকের বাস, সকলের বাড়ীতেই দেশী কাপড় ও নুন প্রবেশ করিল।

ধলাতে প্রায়ই কলেরার প্রাদুর্ভাব হইত। একবার খুব ব্যাপক ভাবে কলেরা দেখা দেয়। আমাদের স্কুল বোর্ডিংএর তিনটি ছাত্রের কলেরা হয়—স্কুল বন্ধ হইয়া যায়। বোর্ডিংএর প্রায় সকল ছাত্রই বাড়ী চলিয়া গেল; রোগীর সেবা শুশ্রূষার জন্য স্বেচ্ছায় কয়েকজন রহিয়া গেল—আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমার বয়স অল্প ছিল এজন্য আমাকে বিশেষ কোন কাজ করিতে দেয় নাই—কেবল বড়দের ফরমাশ তামিল করিতে হইত। আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতারও কলেরা হইয়াছিল, আমি তাঁহার বাসায় যাইয়াও সময় সময় রোগীর সেবা করিতাম। এই ঘটনার পর হইতে তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন।

পর বৎসর আমার ছোড়দা আমাকে সাটিরপাড়া স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। সাটিরপাড়া স্কুলের সম্পাদক পরলোকগত ললিতমোহন রায়ের (ইনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন) সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আমি স্কুল বোর্ডিংএ থাকিতাম। কিছুদিন পর বিজয়বাবু সাটিরপাড়া স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসেন। সাটিরপাড়াতেও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল।

সাটিরপাড়ার জমিদার ললিতবাবু স্বদেশী আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি ঢাকাতে ওকালতি করিতেন। ললিতবাবুর ভাই মোহিনীবাবু বাড়ীতে থাকিতেন। মোহিনীবাবু এবং ব্রাহ্মণদীর কামিনী মল্লিক মহাশয় ঐ অঞ্চলের স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আমি অল্প দিনের মধ্যেই সকলের সহিত পরিচিত হইলাম এবং উৎসাহী কর্মীদের একজন হইয়া উঠিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপ্লবদলের উৎপত্তি ও কর্মধারা

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস নূতন রূপ ধারণ করে, তাই ইহাকে কংগ্রেসের দ্বিতীয় রূপ বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে কংগ্রেসের কার্যক্রম ছিল সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করা। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সর্বপ্রথম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল—বৎসরে একবার সকলে একত্রিত হইয়া দেশের অভাব অভিযোগের কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও আলোচনান্তে তাহা সরকারের নিকট নিবেদন করা। তখনকার দিনে ইহাই ছিল দুঃসাহসিক কার্য—এই কার্যটুকুর জন্যই তখনকার কংগ্রেস গরমপন্থী বা বৈপ্লবিক 'এজিটেটর' বলিয়া অভিহিত হইত। বর্তমানে আমরা তাহাকে উপহাস করিতে পারি, নির্বোধ ও ভীরু বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি, কিন্তু বর্তমানের মাপকাঠি দিয়া সেই সময়কে বিচার করিলে ভুলই করা হইবে। কেননা, আজ যাহারা গরমপন্থী, সময়ের ব্যবধানে তাহারাই একদিন নিতান্ত নরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইবে। আজ যাহা দুঃসাহসিক কার্য বলিয়া মনে হইতেছে কাল তাহা সাধারণ কার্য বলিয়া গণ্য হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাবের পূর্বে জেলে যাওয়া ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ কিন্তু এখনকার দিনে জেলে যাওয়া একটি সাধারণ কাজের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে—বাড়ীর মেয়েরাও ইহাতে ভয় পায় না! তাই আজ, আমরা যাহারা গরমপন্থী বা বিপ্লবী বলিয়া গর্ব করিতেছি, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তখনকার যুবকদের নিকট এই আমরাই হয়ত নিতান্ত নরমপন্থী বলিয়া পরিগণিত হইব। স্বাধীন ভারতের যুবকরা মনে করিবে আমরা নিতান্ত ভীরু ছিলাম—নতুবা এতদিন কি করিয়া পরাধীনতার বোঝা বহন করিয়াছি। ১৯০৭-৮ সনে আমরা যেভাবে জেলে থাকিতাম আজকাল

যাহারা জেলে আসে তাহারা তাহা শুনিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিবে, "কেন আপনারা এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন ?" তাহারা জানেনা যে, বর্তমান অবস্থা অকস্মাৎ—একদিনে আসে নাই, তাহার পিছনে জমাট রহিয়াছে বহুদিনের আন্দোলন, শত শত কর্মীর অত্যাচার নির্যাতন ভোগ, সহস্র সহস্র দেশ সেবকের নিবিড় আত্মত্যাগ। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে গভর্ণমেণ্টের কার্যের প্রতিবাদ করা তো দূরে থাকুক, সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করিতেও লোকে ভয় পাইত। জেলখানার কয়েদীরা যেমন কোন পরিদর্শকের নিকট অভিযোগ করিতে ভয় পায়, ভারতবাসীর অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। অবশ্যই কেহ কোন অভিযোগ করিলে যে সরকার তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফাঁসী দিত তাহা নহে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে যে দমননীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহারই ফলস্বরূপ বংশপরম্পরাগত ভয়, এই অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল। অভিযোগ করিলে "না জানি কি হয়" এই অনিশ্চিত ভয়ের জন্যই কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইত না, সকলেই নীরবে সহ্য করিয়া যাইত। এই কারণে কংগ্রেসের এই কার্যকেও সকলেই দুঃসাহসিক কার্য মনে করিত। দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে কিন্তু একদিন এই কংগ্রেসই দৃঢ়স্বরে বলিল—আমাদের দাবী পূরণ না করিলে আমরা বিলাতী পণ্য-দ্রব্য বর্জন করিব। অথচ তখনও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার কল্পনা করিতে পারেন নাই—তখনও তাঁহাদের দাবী ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, যে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন বর্তমানে আমরা ভোগ করিতেছি।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিপ্লবদলের উৎপত্তি হয়। অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা ছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ পি, মিত্র ও পুলিনবাবু। মিত্র মহাশয় ছিলেন দলের নেতা ও পুলিনবাবু ছিলেন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ। পুলিনবাবুর কর্মকেন্দ্র ঢাকাতে। কলিকাতার কেন্দ্রের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু সংগঠন শক্তির অভাবে কলিকাতার কেন্দ্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয় না—পরন্তু ঢাকার কেন্দ্রই সমগ্র বাঙ্গালা বিশেষ করিয়া পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গালায় বিস্তার লাভ করে। কিছুদিন পরে মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হয় এবং পুলিনবাবুই কার্যত দলের নেতা হন।

সমিতির নেতৃবৃন্দ এমন একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করিয়াছিলেন যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটিবে। সমিতির চিন্তাধারায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই হইতেছে মনুষ্যত্ব এবং উহার বিকাশ শুধু অনুশীলনদ্বারাই সম্ভবপর; কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত মনুষ্যত্বের এই পূর্ণবিকাশ হইতে পারে না, তাই সর্বাগ্রে চাই দেশের স্বাধীনতা। দেশের এই স্বাধীনতাকে লক্ষ্য রাখিয়া পুলিনবাবুর নেতৃত্বে সমিতি বাঙ্গালার সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। পুলিনবাবুর অসাধারণ প্রতিভা ও সংগঠন ক্ষমতা ছিল। তাই ভারতের প্রায় সকল বিপ্লবী-দলই এক আঘাতে, দলহিসাবে, শেষ হইয়া যায়, কিন্তু অনুশীলন সমিতির উপর দিয়া নানা আঘাত প্রত্যাঘাত বহিয়া যাওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুতেই তাহার ধ্বংস হয় নাই, বরং ভারত ও ব্রহ্মদেশের সর্বত্র সমিতি আরও বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে পুলিনবাবুর সংগঠন কৌশল। পুলিনবাবু ঢাকাতে থাকিতেন এবং তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। পুলিনবাবু মহারাষ্ট্র দেশীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে অসি ও ছোরা খেলা এবং দেশীয় পাইকদের নিকট হইতে লাঠিখেলা শিক্ষা করেন। পুলিনবাবু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই দেশের মধ্যে তিনি ক্ষাত্র-শক্তি জাগাইতে প্রয়াসী হইলেন এবং সমিতির মধ্যে অসিখেলা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ও ড্রিল শিক্ষা প্রভৃতি প্রচলন করিলেন। সমিতির প্রধান-কেন্দ্র ছিল ঢাকা। ঢাকায় সমিতির একটি বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছিল। সেই বোর্ডিং-এ প্রায় দুইশত ছাত্র থাকিত। তাহারা সকলেই বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। এই যুবকদের সকলপ্রকার ব্যয়ভার সমিতি হইতেই নির্বাহ হইত। তাহারা সেখানে থাকিয়া লাঠিখেলা ছোরাখেলা প্রভৃতি শিক্ষা করিত এবং সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে গিয়া তাহার শাখা স্থাপন করিয়া সেখানকার নূতন সভ্যদিগকে ঐ সমস্ত খেলা শিখাইত। এইভাবে অনুশীলন সমিতির শাখা বাঙ্গালাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। স্বদেশী আন্দোলন দেশের মধ্যে একটা নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিলে জনসাধারণের মধ্যে একটা বীরত্বের ভাব সঞ্চারিত

হইল। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়িল অসিখেলা ও ড্রিল শিক্ষার উপর। এই সময় কোন কোন স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইল এবং সমিতির সভ্যেরা বীরত্বের সহিত উহার সম্মুখীন হইল। ফলে, সমিতির উপর সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়া আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিল। একদিন শনিবার বৈকালে সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ঢাকা হইতে একজন ভদ্রলোক আসিলেন। তাঁহার বাড়ী সাটিরপাড়ারই নিকট এবং তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বরদাকান্ত দেব মহাশয়ের পরিচিত। বরদাবাবুকে তিনি বলিলেন যে সাটির-পাড়ায় সমিতির শাখা স্থাপন করিতে হইবে। বরদাবাবু আমাকে ডাকিয়া আমার মত জিজ্ঞাসা করিলে আমি সম্মত হইলাম। আগন্তুক ভদ্রলোকটি তখন বরদাবাবু ও আমাকে সমিতির 'প্রতিজ্ঞা' করাইলেন এবং সামান্য কিছু লাঠিখেলা শিক্ষা দিলেন। পরদিন যাত্রাকালে তিনি সমিতির নিয়মাবলী ও প্রতিজ্ঞা-পত্র দিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন, আমরা যেন সর্বদা মনে করি আমাদের জীবন দেশের জন্য। প্রতিজ্ঞাগুলি ছিল অতি সাধারণ, যেমন (১) আমি কখনও এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না। (২) সর্বদা আমি আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিব। (৩) নেতার আদেশ আমি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতি-পালন করিব। —আমার গুরুদেবের বিদায়কালীন বাণী আমি সর্বদা মনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি—প্রতিজ্ঞাগুলিও পালন করিয়াছি। কিন্তু আমার গুরুদেব তাঁহার নিজের জীবনে তাহা পালন করেন নাই—কিছুদিন পর বিবাহ করিয়া তিনি অর্থোপার্জন করিতে আরম্ভ করেন ও শেষ বয়সে অসুখে ভুগিয়া মারা যান।

বরদাবাবু ও আমি ১৯০৬ সনে সাটিরপাড়াতে প্রথম অনুশীলন সমিতির সভ্য হইলাম। অতঃপর আমাদের মধ্যে কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে হইল। বরদাবাবু আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি আপত্তি জানাইয়া বলিলাম ইহা কিছুতেই হইতে পারে না, কারণ, আপনি আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, উপরের ক্লাশে পড়েন, উপরন্তু আপনিই প্রথম প্রতিজ্ঞা

করিয়াছেন। কাজেই আপনি সম্পাদক হউন, আমি আপনার সহকারীরূপে কাজ করিব। বরদাবাবু কিছুতেই রাজী হইলেন না, বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই, আমিই সব করিয়া দিব।" অগত্যা আমাকেই সম্পাদক হইতে হইল, বরদাবাবু হইলেন সহকারী সম্পাদক। বরদাবাবু ও আমার চেষ্টায় সাটিরপাড়ায় সমিতির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার পর আমরা বিভিন্ন গ্রামে যাইয়াও শাখা-সমিতি স্থাপন করিতে লাগিলাম। কাহারও অসুখ হইলে আমরা যাইয়া সেবা করিতাম, গ্রামে চোরের উপদ্রব হইলে রাত্রে আমরা পাহারা দিতাম। মেলার সময় জলসত্র খুলিতাম, যাত্রীদের সাহায্য করিতাম ও শান্তিরক্ষা করিতাম। ক্রমে সাটিরপাড়াতে ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া গেল, তাহার পরিবর্তে আরম্ভ হইল লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ডন কুস্তি ও ড্রিলশিক্ষা। প্রথম সমিতির বোর্ডিং হইতে লোক আসিয়া আমাকে শিখাইয়া যাইত। পরে আমি সকলকে শিক্ষা দিতাম। পুলিনবাবুও দুই একবার সাটিরপাড়া আসিয়া শাখা-সমিতি পরিদর্শন করিয়া যান।

এক চৈত্র সংক্রান্তিতে সাটিরপাড়ার নিকট মেলা বসিয়াছে। মেলাটি তিন দিন থাকিবে। আমরা মেলায় জলসত্র খুলিয়াছি। নিজেরাই কলসে করিয়া জল আনিয়া বড় বড় মাটির জালা পূর্ণ করিয়া রাখিতাম। জল আনিবার সময় যাহাতে অপর কেহ স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য সকলকে রাস্তা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ জানাইতাম। কারণ আমরা না মানিলেও সমাজে অস্পৃশ্যতা দোষ তখনও প্রবল ছিল, স্পর্শদোষ হইলে অনেকে আমাদের জল পান করিয়া জাতি নষ্ট করিতে রাজী হইবে না! দ্বিতীয় দিন বৈকালে "ভুলু" জল আনিতেছিল। সেই রাস্তা দিয়া থানার দারোগা যাইতেছিলেন। দারোগারা এবং জেল-দারোগারা বরাবরই নিজদিগকে লাটসাহেব হইতেও অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করেন। "ভুলু" 'সর-সর' বলিয়া জল লইয়া আসিতেছিল, দারোগাবাবু মনে করিলেন তাঁহাকে অপমান করা হইল। তিনি 'ভুলুকে' বেশ করিয়া শাসাইয়া গেলেন। ঘটনাটি অতি সামান্য এবং 'ভুলুও' বিশেষ কিছু মনে করে নাই। আমি কিছুক্ষণ পর যখন এই ঘটনা জানিতে পারিলাম, দারোগাবাবু

তখন মেলা ছাড়িয়া থানায় চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটি তিল হইতে তাল হইয়া চারিদিকে প্রচারিত হইল ও অবশেষে সকল দোষ আমার স্কন্ধে আসিয়া চাপিল। জমীদার বাড়ীর হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ খুব বীরত্বের সহিত লাঠি ঘুরাইতে লাগিল—আমি কেন দারোগাবাবুর অপমানকর উক্তির কোন প্রতিবিধান করিলাম না, এজন্য সমস্ত বিরূপ সমালোচনা আমার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিলেন যে, "ছেলেমানুষ, দারোগা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল।" মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে অবশ্যই দুই একজন বলিয়াছিলেন, "খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়াছে।" আমি কিন্তু ইহার মধ্যে ভয়েরও কিছু দেখি নাই, মাথা ঠাণ্ডা রাখিবারও কিছু দেখি নাই। যাহা হউক এই সব পরস্পর বিরোধী মন্তব্য শুনিয়া আমি একটু দুঃখিত ও উত্তেজিত হইলাম এবং সন্ধ্যাকালে নিকটবর্তী গ্রামের সমিতির সম্পাদকের নিকট পত্র পাঠাইলাম। পরদিন তিনশত ভলাণ্টিয়ার লাঠি সহ উপস্থিত হইল। খেলার মাঠে কিছুক্ষণ 'রাইট-লেফ্ট্' করাইয়া আমি তাহাদিগকে আদেশ দিলাম যে মেলার মধ্যে দারোগাকে দেখিলেই পিটাইতে হইবে। দারোগাও কিছু বিপদাশঙ্কা করিয়াছিলেন তাই তিনিও থানার সমস্ত চৌকিদার আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। সমিতির ভলাণ্টিয়ারগণ বীরদর্পে মেলায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল ও সময় সময় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে থাকিল। কিন্তু ইহা সত্বেও সেদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই, কেননা যে কারণেই হউক দারোগাবাবু সেদিন মেলায় উপস্থিত হন নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে আমাকে "ছেলেমানুষ ও ভীরু" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এই ঘটনা হইতে তাঁহারা আশ্বস্তবোধ করিলেন।

আমার নাম ছিল ত্রৈলোক্যমোহন। কিন্তু 'মোহন' শেষ পর্য্যন্ত 'নাথে' পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইহার একটি ইতিহাস আছে। একদিন বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কর্মস্থল হইতে আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র আসিল, তাহাতে লেখা ছিল, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্র। সে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান

করে, সুতরাং তাহার নাম কেন বিদ্যালয় হইতে কাটা যাইবে না—ইত্যাদি। ইহাও ছিল যে আমি কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিব না এই মর্মে যেন একখানা প্রতিশ্রুতিপত্র লিখিয়া দেই। চিঠি পাইয়া শিক্ষক মহাশয়গণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আমি কিন্তু আনন্দিতই হইলাম। আমি এইজন্য আনন্দিত হইলাম যে আমার নাম কাটিয়া দিলে আমি ঢাকায় গিয়া সমিতির বোর্ডিংএ থাকিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিব। আমার মাষ্টার মহাশয়গণ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাদের চিন্তা হইল কি করিয়া তাঁহারা আমাকে রক্ষা করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহারা স্থির করিলেন যে তাঁহারা উত্তরে লিখিবেন "ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়া আমাদের স্কুলে কেহ নাই।" পরে ভাবিয়া দেখিলেন যে ইহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না। সমাধানের জন্য তাই তাঁহারা ললিতবাবুর উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন, ললিতবাবু সকল দিক রক্ষা করিয়া একখানা মুসাবিদা লিখিয়া পাঠাইলেন। মুসাবিদার মর্ম ছিল : আমি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই না বা দিবার ইচ্ছা রাখি না, আমি শুধু স্বদেশী ব্যায়াম করি এবং স্বদেশী খেলা খেলি, শীতলবাবু আমাকে দিয়া ঐ মুসাবিদার নকল করাইয়া যথাসময়ে তাহা পাঠাইয়া দেন। ঐ মুসাবিদায়ও আমার নাম ত্রৈলোক্যনাথই লেখা ছিল। ইহার পর হইতে এই চিঠির ফলে বিদ্যালয়ের হাজিরা-বহিতে আমার নাম 'মোহনের' পরিবর্তে 'নাথ' লিখিত হইল এবং আমি ত্রৈলোক্যনাথ হইলাম।

প্রতি বৎসর সমিতির কৃত্রিম-যুদ্ধ (mock-fight) হইত এবং সময় সময় খেলারও প্রতিযোগিতা হইত। খেলার প্রতিযোগিতায় দুই-একবার আমি পুরস্কারও পাইয়াছি। এই কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা একটা দেখিবার জিনিষ ছিল। সহরের বহুলোক উহা দেখিতে যাইতেন। জেলা হাকিম, পুলিশ সাহেবরাও যাইতেন। তাঁহারা তামাসা দেখিতে যাইতেন কি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে যাইতেন তাহা তাঁহারাই জানেন। কৃত্রিম-যুদ্ধে উভয়-পক্ষে সমিতির পাঁচ-সাত হাজার সভ্য সমবেত হইয়া, ছোট লাঠি, বড় লাঠি, ছোরা

প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর বড় বাঁশ বাঁধিয়া তাহাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইত। যে-দল যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলের ঐ জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইতে পারিত ও প্রধান সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত সেই দলই জয়লাভ করিত। বহুলোক এই 'যুদ্ধে' আহত হইত। এজন্য পূর্ব হইতেই হাঁসপাতাল ও ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকিত। প্রত্যেক লাঠির মধ্যে রং মাখান থাকিত এবং কাহারও কাপড়-জামায় ঐ রং লাগিলে সে আহত বলিয়া গণ্য হইত ও তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। কেহ তাহাকে প্রহার করিতে পারিত না এবং অ্যাম্বুলেন্স (Ambulance) আসিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইত। এক কৃত্রিম-যুদ্ধে আমি আহত হইয়াছি, অর্থাৎ বিপক্ষের লাঠির আঘাতে আমার জামায় রংএর দাগ লাগিয়াছে। আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমি মারামারি করিয়া যাইতেছি—এমন সময় একজন পরিদর্শক সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি আমার ঘাড় ধরিয়া আমাকে বসাইয়া দিলেন। এদিকে অপর রাস্তা দিয়া বিপক্ষের একটি দল আসিয়া আমাদের দলের উপর সঙ্গীন-চালনা (Bayonet charge) করিল। চারিদিকে চাহিয়া যখন দেখিলাম, পরিদর্শকটি চলিয়া গিয়াছে তখন একখানা বড় লাঠি লইয়া আমি বিপক্ষ দলটিকে বাধা দিলাম। পরে দূর হইতে তাহারা আমাদের দলের উপর বড় লাঠি নিক্ষেপ করিতে লাগিল—আমরাও পাল্টা জবাব দিতে লাগিলাম। হঠাৎ বিপক্ষের একটি বড় লাঠি আসিয়া আমার কপালে পড়িল। তাহা ফিরাইতে না পারায় আমার কপাল বাহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এমন সময় অ্যাম্বুলেন্স (Ambulance) আসিয়া আমাকে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং একখানা গাড়ীতে করিয়া হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল। সেই রাত্রেই হাঁসপাতালে থাকিয়া সংবাদ পাইলাম আমাদের অর্থাৎ মফঃস্বলের জয় হইয়াছে।

সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালীবাড়ী অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে, কোন এক তিথিতে, সেখানে হাজার হাজার লোক পূজা দেখিতে আসে। এই পূজায় চা'র-পাঁচশ' পাঁঠা এবং পাঁচ-সাতটা

মহিষ বলি পড়ে। একবার গুজব রটিল যে এই পূজার দিন মুসলমানরা কালীবাড়ীটি আক্রমণ করিবে। আমি মফঃস্বল সমিতির সম্পাদকগণকে সংবাদ দিলাম, সেইদিন প্রাতে লাঠিসহ সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। প্রায় পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক ঐ দিন উপস্থিত হইল। প্রথমে তাহাদিগকে 'কুচকাওয়াজ' করাইলাম, পরে যাত্রীদের সুবিধার জন্য তাহাদের নানা কাজে বিভক্ত করিয়া দিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই এবং যাত্রীরা সকলে বিদায় হইলে আমরাও প্রত্যাবর্তন করিলাম।

সাটিরপাড়া ছিল মফঃস্বল সমিতির একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে প্রায় দেড়-শত সভ্য ছিল। এই কেন্দ্রের অধীনে পঞ্চাশটি শাখা-সমিতি ছিল। আমরাই গ্রামে-গ্রামে যাইয়া ঐ সকল শাখা-সমিতি স্থাপন করি। উহাদের সভ্যগণকে আমরাই খেলা শিখাইতাম। এইভাবে সমিতির কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিলে একদিন শুনিতে পাওয়া গেল বাহ্রা গ্রামে একটি ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতরা সকলেই ভদ্রলোক এবং তাহারা পুলিশের সহিত লড়াই করিয়া পলাইয়া গিয়াছে, ধরা দেয় নাই। এই ঘটনায় এক অভিনব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। পুলিশ ঢাকা-সমিতির বোর্ডিং ও অন্যান্য স্থান থানাতল্লাসী করিতে আরম্ভ করিল। এই বাহ্রা ডাকাতির একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলে পাঠকের স্বদেশী ডাকাতদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে। ১৯০৮ সনে বাহ্রা ডাকাতি হয়। পুলিশ মনে করে ইহা অনুশীলন-সমিতির কাজ। এই ডাকাতিতে যুবকের দল অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছে। এই ডাকাতেরা প্রমাণ করিয়াছে বাঙ্গালীরা ভীরু নয়; বাঙ্গালী লড়াই করিতে জানে, মরিতে জানে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন ছিল, সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আক্রমণ করিতে পারে নাই, তাহারা মধ্য রাত্রিতে বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল এবং যখন তাহাদের লুণ্ঠন কার্য শেষ হয় তখন প্রায় ভোর হইয়াছে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিয়া নৌকায় উঠিয়াছে, নৌকার দাঁড়ী মাঝির কাজও তাহারাই চালাইয়াছে। অপ্রশস্ত খালের মধ্য দিয়া ডাকাতের দল-নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। ডাকাত দেখার জন্য খালের দুই পাড়ে শত-শত লোক নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে।

ডাকাত ধরার জন্য বহুলোক বন্দুক, কোচ, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ডাকাতদের আক্রমণ করিয়াছে। ডাকাতের দল মাঝে-মাঝে বন্দুক ছুড়িয়া লোকদিগকে ভয় দেখাইতেছে। ইতিমধ্যে থানায় সংবাদ পৌছিয়াছে। দারোগা পুলিশ কনষ্টেব্‌ল্‌ও বন্দুকসহ উপস্থিত হইয়াছে। খণ্ডযুদ্ধ সুরু হইয়াছে। এভাবে কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়াছে : ডাকাতের দল ছোট নদী হইতে বড় নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। চারিদিকে সংবাদ পৌছিয়াছে। বিভিন্ন থানার পুলিশ-বাহিনী সহ দারোগারাও বন্দুক লইযা ডাকাত ধরার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। পুলিশের লোক ছাড়াও যাহাদের বন্দুক ছিল তাহারাও বন্দুক-সহ উপস্থিত হইয়াছে। লড়াই চলিতেছে। ধলেশ্বরী নদীতে শত শত নৌকা, সহস্র-সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে গুলির আওয়াজ আসিতেছে, উভয় পক্ষেই হতাহত হইয়াছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিন এ ভাবেই চলিতেছে। ডাকাতির সংবাদ ইতিমধ্যে ঢাকাতে পৌছিয়াছে। পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ট সাহেব ডাকাত ধরার জন্য গুর্খা সৈন্য সহ 'লঞ্চ,' যোগে রওনা হইয়াছেন। ডাকাতেরা ছিল তরুণ যুবক। আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত পরিশ্রম করিতেছে। হতাহত হইতেছে। নৌকা গুলী-বিদ্ধ হওয়ায় অনবরত নৌকায় জল উঠিতেছে। কয়েকজন জলসেচার কাজে নিযুক্ত আছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিক অন্ধকার, ধলেশ্বরী নদী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছে। ধলেশ্বরীর রুদ্রমূর্তি, উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া বহুলোকের মনে ডাকাত ধরা অপেক্ষা প্রাণ বাঁচানোর চিন্তাই প্রবল হইল। নিশার অন্ধকারে ডাকাতের নৌকা যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল কেহ তাহার সন্ধান পাইল না।

স্বদেশী যুগে লোকের মনে আজিকার মতো নেতৃত্ব স্পৃহা ছিল না, স্পৃহা ছিল দেশের সেবা করিবার, আর তখনকার দিনে দলাদলি ছিল না, দলাদলির স্থানে ছিল সহযোগিতা। আমি যখন থার্ড-ক্লাসে অধ্যয়ন করি তখন আমার অধীনে মহেশ্বরদী পরগণায় পঞ্চাশটি শাখা-সমিতি ছিল। সেই সব সমিতির সম্পাদক ছিল—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক—প্রধান পণ্ডিত—কেহ আই. এ. পাশ, কেহ বি-এ পাশ, কেহ পোষ্ট-মাষ্টার, কেহ তালুকদার। সকলেই ছিলেন বয়সে ও বিদ্যায় আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাটিরপাড়াতেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক ছাত্র সমিতির সভ্য ছিল। আজকালকার যুগে ইহা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারিবেন না, মনে করিবে হয় ইহা অসম্ভব না হয় ইহা অতিরঞ্জিত। অথচ ইহার মধ্যে অসম্ভব বা অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। ইহাতো মাত্র সেদিনের কথা, আমার শিক্ষক মহাশয় ও বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই এখনও জীবিত আছেন। সাধারণ লোক হইতে পৃথক করিয়া দেখানো যায় আমার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্বও ছিল না—তখনকার দিনে নেতার নির্দেশ পালনে বয়স ও বিদ্যার প্রাধান্যও কেহ কোনদিন দেখিতে চাহে নাই। ইহাই ছিল তখনকার কর্মীদের নিকট যুগ-ধর্ম। এখন প্রেসিডেণ্ট-সেক্রেটারী, ইলেকসনের সময় কত দলাদলি, মারামারি, মাথা ফাটাফাটি হয় ; কিন্তু সেই যুগে ইহা কল্পনারও অতীত ছিল। সকলেই মনে করিত সমিতি যাহার উপর ভার দিয়াছে সে যে-কেহই হউক, তাহারই কথা আমরা শুনিব এবং সকলে মিলিয়া আমরা তাহাকে সাহায্য করিব। প্রত্যেকটি কাজে আমি সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি। সকলেই আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। আমি যখন সময় সময় সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ে ড্রিল করাইয়াছি তখন অনেক সময় অনেককে ধমক দিয়াছি কিন্তু উহাতে কেহ আমার উপর কোনদিন বিদ্বেষভাব পোষণ করে নাই বরং তাহারা লজ্জিতই হইয়াছেন। আজকাল কোন যুবক-কর্মীকে কাজের কথা বলিলে প্রথমতঃ সে একদফা তর্ক করিবে কারণ সে তো অন্ধ-বিশ্বাসী নহে, তাহাকে বুঝিতে হইবে কাজটি ঠিক কিনা—অতঃপর দুই ঘণ্টা তর্কের পরে সে বলিবে 'এ কাজের ভার ত অন্যের উপর দেওয়া যাইতে পারে।" ইহাই হইতেছে আজকালকার অধিকাংশ যুবকের কর্ম-চরিত্র। আজকালকার ছেলেরা অবশ্য বুঝে বেশী, তাই বোধ হয় তর্কও করে বেশী। তর্ক করিতে করিতেই সমস্ত শক্তি নষ্ট করে, কাজ করিবার আর বেশী ক্ষমতা থাকেনা। অথচ তখনকার ছেলেরা কাজই বেশী করিত, তর্ক করিত না। তখনকার

দিনে যখন যাহাকে যাহা বলা হইয়াছে, বিনা বাক্য ব্যয়ে সে তখনই তাহা করিয়াছে। আজকাল কোন একটি ছেলেকে শাসন করিলে সে হয়ত দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, অথবা গোপনে দল পাকাইবার চেষ্টা করিবে—ষড়যন্ত্র করিবে। তাই দেখা যায় বর্তমান যুগে ভাব-প্রচার যথেষ্ট হইয়াছে কিন্তু আন্তরিকতা কমিয়া গিয়াছে। নেতা হওয়াও তখন বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। নেতৃত্ব তখন মোটেই লোভনীয় ব্যবসা ছিল না। নেতাদের বিপদই ছিল তখন বেশী, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, গুলির আঘাতে মৃত্যু। অনুশীলনের নেতা প্রত্যেকেই ছোট হইতে বড় হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যেককে বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া বসিতে হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, হয়তো সেখানে কোন ভদ্রলোকের বাস নাই, সেখানে প্রথমে তাহাকে একটা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকিতে হইয়াছে, গ্রামের লোকের মুষ্টিভিক্ষার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সেখানে যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, যে অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছে, যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও ত্যাগের পরিচয় দিতে পারিয়াছে সে-ই ধীরে ধীরে প্রধান-কেন্দ্রে আসিয়াছে। দলের লোক তাহাকেই নেতা বলিয়া মানিয়া লইযাছে। তখন কোন 'ইলেকসন' ছিল না, তখন ছিল যোগ্যতা। বর্তমান, গণতন্ত্রের যুগে, কে কার নেতৃত্ব মানিবে, সকলেই নেতা।

সমিতির ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এই অর্থের অভাব কোনদিন হয় নাই—নানাভাবে অর্থ সমস্যার সমাধান হইত। আমার খরচের জন্য বাড়ী হইতে যে টাকা পাঠাইত তাহা সব খরচ হইত না। অবশিষ্ট যাহা থাকিত সমিতির কাজে তাহা ব্যয় করিতাম। আমার দুধ ও জলখাবারের টাকা বাঁচিয়া যাইত। কারণ সকলের সামনে একা দুধ ও জলখাবার খাইতে লজ্জাবোধ হইত। সময় সময় বাড়ী হইতে ঘি, কাপড়-জামা বই প্রভৃতির নাম করিয়াও টাকা আনাইয়া সমিতির কাজে ব্যয় করিয়াছি। আমার বাড়ী হইতে টাকা পাঠাইতে কেহ কখনও কার্পণ্য করে নাই বা আমাকে সন্দেহও করিত না। যখন যত টাকার জন্য লিখিতাম তাহাই পাইতাম। আমরা সাটিরপাড়াতে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলাম—সপ্তাহে দুই মণ চাউল পাইতাম। ঐ

চাউল-বিক্রীর টাকা সমিতির তহবিলে জমা হইত। কিছুদিন পর আয়ের আর একটি পথ আবিষ্কৃত হইল। আমাদের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন বলিলেন—শ্রাদ্ধের বৃষ ও বৎসতরী শাস্ত্রানুসারে অস্বামিক, বর্তমানে গোয়ালা ও বৈদিক ব্রাহ্মণে লইয়া যায়, তোমরা দেশের কাজের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পার। ইহার পর যেখানেই শ্রাদ্ধ হইত সেখানেই যাইয়া আমরা বৃষ ও বৎসতরী লইয়া আসিতাম। উহা বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা সমিতির তহবিলে জমা দিতাম। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রণও খাইতাম, দক্ষিণাও নিতাম। দক্ষিণার পয়সাও সমিতির প্রাপ্য ছিল। আমরা একবার বলপূর্বক গো-হরণ করি—আমার বন্ধু ও সমিতির সভ্য গোতাসিয়া গ্রামের বীরেন ভট্টাচার্যের বাড়ীর শ্রাদ্ধে। বীরেনের বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল। কাজেই শ্রাদ্ধে বেশ টাকাপয়সা খরচ করিবে। শ্রাদ্ধের দিন আমরা ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক লাঠি সহ সেখানে উপস্থিত হইলাম। গোয়ালা ও ব্রাহ্মণগণও স্থির করিলেন যে তাঁহারা আমাদিগকে বাধা দিবেন। বীরেন খুব আদর-যত্ন করিয়া সকলকে খাওয়াইল, আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ হিসাবে দক্ষিণাও পাইলাম। শ্রাদ্ধের পর গোয়ালা এবং ব্রাহ্মণদের সহিত আমাদের একটি খণ্ড যুদ্ধ হইল। আমরাই জয়ী হইলাম এবং গোধন লইয়া চলিয়া গেলাম। এই ঘটনার পর বৈদিক ব্রাহ্মণ ও গোয়ালাদের প্রতিনিধি ঢাকায় যাইয়া নেতাদের নিকট অভিযোগ করেন এবং এই সর্তে মীমাংসা হয় যে গোধনের পরিবর্তে তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদিগকে সমিতির সভ্য করিয়া দিবেন, শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষে সমিতিকে চাঁদা দিবেন এবং আমরা আর বলপূর্বক গো-হরণ করিতে পারিব না।

নারায়ণগঞ্জে সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সমিতির সভ্য অনেক উকীল ও মোক্তার আছেন। এক সময়ে তাঁহারা খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন, এখন সকলেই অর্থোপার্জনে মন দিয়াছেন। আমার সহিত দেখা হইলে সম্ভবতঃ পূর্বস্মৃতি জাগে, তাই একটু খাতির করেন। বহু বৎসর পর একদিন নারায়ণগঞ্জে এক উকীলের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সে সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ে আমার এক ক্লাস নীচে পড়িত। পূর্বে সে সমিতির সভ্য ছিল এবং আমাকে "দাদা"

ডাকিত। তাহার দাদা আমার এক ক্লাস উপরে পড়িত। সেও সমিতির খুব উৎসাহী সভ্য ছিল এবং আমার সহিত খুব বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীমান্‌কে দেখিয়া আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু সে প্রথমতঃ আমাকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কেমন আছ?' সে উত্তর করিল, 'ভাই, ভাল আছি—তুমি কেমন আছ?' আমি প্রশ্ন করিলাম, 'তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ?' সে বলিল, 'বল কি হে? তোমাকে চিনিতে পারি নাই?' আমি বলিলাম, 'ওকালতি চাল ছাড়, বলতো আমার নাম কি?' সে তবু হার মানিতে চাহিল না, বলিল, 'তোমার নাম বলিতে হইবে না, তোমাকে আমি বেশ চিনি।' তখন আমি বলিলাম, 'ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে চেন?' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ভীত এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া, এক লাফে চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'দাদা, বাস্তবিকই আপনাকে চিনিতে পারি নাই।'

সাটিরপাড়ার নিকট মাছিমপুর গ্রামে আমাদের শাখাসমিতি ছিল। সেই সমিতির সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিল দুই ভাই। তাহারা উভয়েই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। তাহারা খুব উৎসাহী, বিনয়ী এবং এতটা বাধ্য ছিল যে কেহ তাহাদিগকে কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। মাছিমপুর সমিতিটি আমার এক সহকারীর অধীন ছিল। একদিন সংবাদ পাইলাম সহরে খেলার প্রতিযোগিতা হইবে। আমরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিব মনস্থ করিলাম। ইহা জানিতে পারিয়া, গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় আমার সহকারীর নিকট প্রস্তাব করিল, যে, তাহাদের এক প্রকার নৌকা আছে, বিনা ভাড়ায় তাহারা সেই নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে। আমাদের নিজেদেরই নৌকা চালাইয়া সহরে যাইতে হইবে। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম। নৌকা ছয় মাইল দূরে শীতললক্ষার পারে ছিল—গুপ্তচর দুইটি আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া চলিল। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় আমরা নদীর ধারে এক নির্জন স্থানে একটি নৌকা দেখিতে পাইলাম। গুপ্তচরদের নির্দেশ অনুসারে আমরা সেই নৌকায় উঠিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় সহ আমরা প্রায় মোট আঠার জন

ঐ নৌকায় ছিলাম। ঢাকা কতদূর—যাইতে কতদিন লাগিবে, এতগুলি লোক লইয়া যাইতেছি—তাহারা রাস্তায় কি খাইবে—ইত্যাদি চিন্তা আমার মাথায় আসে নাই। নৌকাতে কোনো আলো ছিল না; উপরন্তু আমরা সকলেই নৌকা চালানো সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলাম। যাহা হউক, স্রোত আমাদের অনুকূল ছিল, নৌকা চলিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে ডাঙ্গাবাজারে আমাদের নৌকা পৌঁছিল। সারারাত্রির পরিশ্রমে সকলেই ক্ষুধার্ত ছিল—বাজার নিকট দেখিয়া চিড়াগুড় কিনিবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবে আমার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিলাম, 'টাকা তো আনি নাই।' যদু তখন আমাকে রক্ষা করিল। সে বলিল, 'টাকা আমার নিকট আছে।' বলিয়া সতের টাকা আমার হাতে দিল। যদু কিছুদিন পূর্বে আমাদের গ্রামের সমিতি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিল, আমাদের গ্রামের কয়েকজন গান গাহিয়া, ভিক্ষা করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহারা সেই টাকা যদুকে দিয়াছিল। যদু পূর্বদিন সাটিরপাড়া ফিরিয়াছে। সে সেই টাকা আমাকে দিয়াছিল। তখন আমি কাজে ব্যস্ত থাকায় বলিয়াছিলাম, "এখন তোমার নিকটেই রাখ।" যদু বুদ্ধি করিয়া সেই টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সেই টাকা হইতে এখন চিড়াগুড় কেনা হইল। এই সময় একটি গুপ্তচর বলিল, তাহার শরীর বিশেষ ভাল বোধ হইতেছে না, বাড়ীতেও একটু কাজ আছে। সে বাড়ীর কাজটুকু সারিয়া সেইদিনই ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিবে এবং সেইখানে আমাদের সহিত দেখা করিবে। আমি তখন কোন সন্দেহ করিতে পারি নাই, তাই তাহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলাম। সে চলিয়া গেল, আমরাও নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। গুপ্তচরটি ডাঙ্গাবাজারে নামিয়া নরসিংদী থানার দারোগা সহ ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জে রওনা হইল। আমাদের নৌকায় থালা, বাটি, ঘটি কিছুই ছিল না, কাজেই খাইবার খুব অসুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু উৎসাহ ও আনন্দে কেহ তাহা গ্রাহ্য করে নাই। বৈকালে আমাদের নৌকা নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিল। রাস্তায় যদুর খুব জ্বর হইয়াছিল। পূর্ব রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই ছিল না। জ্বরের ঘোরে সে কতকটা অজ্ঞান অবস্থায়

রহিয়াছে। সঙ্গের গুপ্তচরটি, আমাদের নৌকা নিরাপদে রাখিবে বলিয়া স্থির ছিল, সে তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। যন্ত্র সেবার জন্য আমি ও বিনোদ নৌকায় রহিলাম। অপর সকলকে ঢাকা পাঠাইয়া বলিয়া দিলাম, তাহারা ট্রেনে ঢাকা যাইয়া আমাদের সংবাদ দিবে। কিছুক্ষণ পর গুপ্তচরটি একটি হিন্দুস্থানী 'কন্‌ষ্টব্‌ল্‌কে' ময়লা কাপড় পরাইয়া বাসার চাকর সাজাইয়া আনিয়া আমাকে বলিল, সে তাহার এক আত্মীয়ের বাসার চাকর, সে নৌকা পাহারা দিবে। আমি নৌকার জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম। ঘণ্টাখানেক পর দেখিতে পাইলাম অনেকগুলি পুলিশ আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ক্রমে তাহারা নিকটবর্তী হইল এবং পরে দৌড়াইয়া ও লাফাইয়া আমাদের নৌকায় উঠিল। সারা নৌকা তাহারা তন্ন-তন্ন করিয়া তল্লাসী করিল কিন্তু কিছুই পাইল না। অবশেষে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম কারাজীবন

আমরা এখন নারায়ণগঞ্জ জেলে আছি। জেলের খাওয়ায় আমদের পেট ভরিত না—রাত্রে মশার কামড়ে ঘুম হইত না। 'হাজতী' ছিলাম বলিয়া আমাদের কাজকর্ম কিছু ছিল না। ললিতবাবু আসিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, বাড়ী হইতেও আমার মেজদা শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন চক্রবর্ত্তী আসিয়াছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের রিপোর্ট ছিল আমরা নৌকা চুরি করিয়া ডাকাতি করিতে যাইতেছিলাম। ডাকাতির অভিপ্রায়ের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তাই আমাদের বিরুদ্ধে শুধু নৌকাচুরির অভিযোগ আনা হইল। কয়েকমাস হাজত বাস করিবার পর বিচারে আমাদের পাঁচমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইল। টাকা অনাদায়ে আরও একমাস জেল। জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাই আমাদের পাঁচমাস জেল খাটিতে হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলে এক সপ্তাহ ছিলাম। সেখানে আমাদের গম পিশিতে হইয়াছিল। এক সপ্তাহ পর আমরা ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে চালান যাই। আমাদের পক্ষ হইতে আপীল করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। জেলে আমাদের তিন জনকেই ঘানিতে দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের গায়ে জোর ছিল, মনে উৎসাহ ছিল, কাজেই বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। অবশ্য প্রথম-প্রথম মাথা ঘুরিয়াছে এবং জল পিপাসা পাইয়াছে। ঘানিঘরে আমাদের চিত্রাঙ্কণ-শিক্ষক মহিমবাবুকে পাইলাম। বিলাতী লবণ ফেলিবার মামলায় তাঁহার তিন মাস জেল হইয়াছিল ও তাঁহাকেও ঘানিতে দেওয়া হইয়াছিল। মহিমবাবুর তখন একমাস বাকী ছিল। মহিমবাবুকে পাইয়া আমাদের খুব সুবিধা হইয়াছিল। আমরা একত্রেই থাকিতাম; ঘানিঘরের ইঙ্কিদার (Instructor) আমাদিগকে একটু খাতির করিত। সে বরিশালের

উপবিষ্ট—বাম হইতে দক্ষিণে—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। দণ্ডায়মান—বাম হইতে—শ্রীআশুতোষ কাহালী, শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযতীন্দ্র রায়।
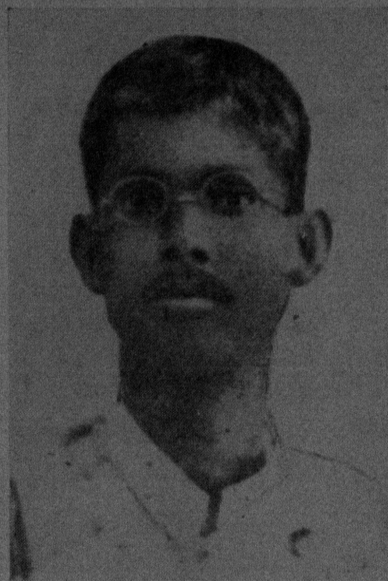
শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন
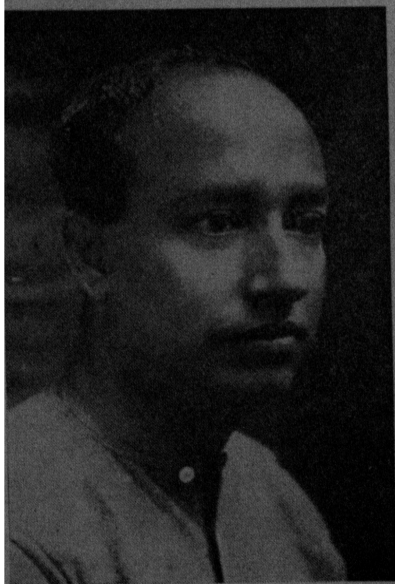
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী
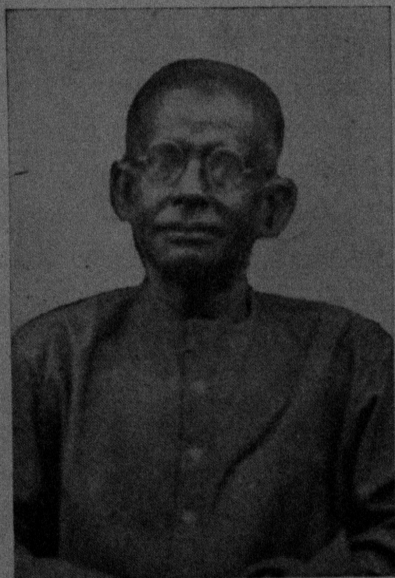
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী

একজন মুসলমান, ডাকাতি মোকদ্দমায় তাহার পনর বৎসর জেল হইয়াছিল। ঘানিতে আমরা একমাসের কিছু বেশীদিন ছিলাম, পরে ছাপাখানার কাজে যাই। আমাদের সাজা অল্প বলিয়া আমাদের লেখাপড়া বা অক্ষর-সংস্থিতির (Compositor) কাজে দেয় নাই। প্রথমতঃ বস্তাটানা, পরে কাগজ গুনিয়া প্রেসে দেওয়ার কাজে দেয়।

সেই যুগে, অর্থাৎ ১৯০৮ সনে জেলের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তখন মারপিট করিয়া, ভয় দেখাইয়া কয়েদীদের সংশোধন করিবার ধারণা ছিল। শুধু এই দেশে নহে, এই ধারণা তখন ইউরোপেও বিদ্যমান ছিল। ইউরোপের জেল সমূহও তখন শোচনীয় ছিল। বর্তমানে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ও অভিজ্ঞতার ফলে পূর্বধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। সেই যুগে কয়েদীরা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইত না, হিংস্র পশুর মধ্যে তাহারা গণ্য ছিল। সেই জন্য তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। একটা প্রবাদ আছে, "ক্রীতদাস ক্ষমতা পাইলে খুব অত্যাচারী হয়। জমিদার যদি তাহার প্রজাকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দেয়, তবে তাহার বরকন্দাজরা প্রজাকে বাঁধিয়া আনে।" জেলখানায় ইহা প্রবাদ নহে, একেবারে বাস্তব ঘটনা। তাই কথা আছে 'জেল হেল' (hell)। আমাদের শাস্ত্রে নরকের যে বর্ণনা আছে তখনকার দিনের জেলের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। জেল তিনটি জিনিষের জন্য বিখ্যাত, ফাইল, গাইল, ডাইল।—জেলখানায় দিনের মধ্যে বহুবার গুনতি হয়, ফাইল করিয়া জোড়া জোড়া বসিতে হয়, জোড়া-জোড়া চলিতে হয়, বে-ফাইলে যাইবার জো নাই। বে-ফাইলে পা-বাড়াইলেই বিপদ। পায়খানায় যাওয়া, স্নান করা, খাওয়া সবই ফাইল অনুসারে। দেরী করিবার উপায় নাই, 'সরকার' বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা রক্ষা নাই। 'গাইল' (গালি) জেল কর্মচারীদের মুখে লাগিয়াই আছে, সম্বোধন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্পর্ক পাতানো চাই-ই। জেল খানায় খাইবার মধ্যে 'ডাইল'। কারণ, ধান ও পাথরের জন্য ভাত খাওয়া যায়না, তরকারীও খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। একমাত্র 'ডাইলই' সম্বল। কাজেই ডাইল দিয়া টাইল ভরিতে হয় অর্থাৎ উদর পূর্তি করিতে হয়।

আমরা যখন জেলে ছিলাম তখন সপ্তাহে ছয় দিনই কলায়ের ডাল দেওয়া হইত। পাঞ্জাবে এবং পশ্চিম-বঙ্গের লোকেরা কলাই-এর ডাল পছন্দ করে কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই 'পিছ্‌লা' ডাইল বিশেষ পছন্দ করে না। অবশ্যই জেলের রান্না, বাড়ীর মতো হয়না। প্রত্যহ এই কলাই-এর ডাল দেওয়ার একটা ইতিহাস পুরাণো কয়েদীদের নিকট শুনিলাম। তাহারা বলিল, পূর্বে এক একদিন এক রকমের ডাল দেওয়া হইত। একবার জেলের আই. জি. জেল পরিদর্শন করিতে আসিলেন।—কয়েদীরা তাঁহার নিকট মাছ খাইবার প্রার্থনা জানাইল। কয়েদীরা বলিল, হুজুর আমরা মাছ খাইতে চাই। আই. জি. বাংলা জানিতেন না। জেলার বাবু তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, যে তাহারা মাসকলাইয়ের ডাল খাইতে চায়। আই. জি. জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ডাল কি খুব দামী?' জেলার-বাবু উত্তর করিলেন, দাম খুব বেশী নয়। আই. জি. হুকুম দিয়া গেলেন—খুব মাস দাও। তখন হইতে মুসুরী ও ছোলার ডাল উঠিয়া গেল—তাহাদের স্থান অধিকার করিল এই মাস-কলাইয়ের ডাল। এই ঘটনা সত্য কিনা জানিনা। তবে জেলখানায় এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। স্বদেশী-আন্দোলনের পূর্বে এই অজ্ঞাত রাজ্যের খবর কেহ রাখিত না। জেল কর্তৃপক্ষগণই ছিলেন এই রাজ্যর সর্বময় কর্তা। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পর রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যাঁহারা জেলে যাইতে লাগিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাহিরে আসিয়া জেলের গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ করিলেন। ফলে দেশবাসী ও সরকারের দৃষ্টি এদিকে পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে জেলব্যবস্থার পরিবর্তনও হইতে লাগিল।

জেলে আসিবার প্রয়োজন আমার ছিল—নিজের দিক হইতে—দেশের দিক হইতেও। জেলে না আসিলে হয়তো উকীল হইয়া ময়মনসিংহ 'বারের' সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতাম। কিন্তু জেল হওয়ায় দেশকে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এতদিন আমি একটা উন্মাদনার বশবর্তী হইয়া চলিয়াছিলাম, গভীরভাবে বিশেষ কিছু চিন্তা করিতাম না, তাই জেলে আমি যেন নূতন-জন্ম লাভ করিলাম। জেলের অন্তরালে আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম। এখানে অতীতের

কথা যখন মনে পড়িয়াছে তখন ভাবিয়াছি, কি ছেলেমানুষই না আমি ছিলাম! দেখিতে দেখিতে পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, এই পাঁচ মাস বাহিরের জগতের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না—আমরা বাহিরের কোন খবরই পাই নাই। মুক্তির দিন দেখিলাম, আমার কয়েকজন আত্মীয় এবং শীতলবাবু জেল গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। শীতলবাবু আমাদিগকে বাস্তবিকই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ১৯০৯ সনের প্রথম ভাগে আমরা জেল হইতে মুক্ত হই এবং শহরে দুই একদিন থাকিয়া বাড়ী যাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুক্তির পর

বন্যা বেশী দিন স্থায়ী হয় না কিন্তু উহারই মধ্যে সে জমি উর্বর করিয়া দিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় এখন ভাঁটা পড়িয়াছে,—কোনদিকে কোন সাড়াশব্দ নাই—নেতৃবৃন্দের সুরও গরমের পরিবর্তে নরম হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ভেদ-নীতি ও দমন-নীতি চালাইয়া আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমি জেল হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। পুলিনবাবু, ভূপেশ নাগ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয় জন নেতা তিন আইনে নির্বাসিত হইয়াছেন। নূতন-নূতন আইন জারী হইয়াছে, প্রকাশ্যে সভা-সমিতির অনুষ্ঠানও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে নৈরাশ্য, ভয় আর অন্ধকার। আমার মনে হইল আমি নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমার জেলই ভাল ছিল। বন্ধুরা ভয়ে আমার সহিত কথা কহিতে চাহেনা। আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে গেলে তাহারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন—'তোমার এখানে না আসাই ভাল। পুলিশ আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে। জেলে যাইয়া আমি যেন একটা কতবড় অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি সকলের নিকট অস্পৃশ্যবৎ হইয়াছি।

১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেস 'নরম' ও 'গরম' দুই দলে বিভক্ত হইল। 'গরম' দলের যাহারা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তাহাদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যখন দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন, তখন 'নরম' দলের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। গরম দলের নেতারাও কিছু করিতে সাহসী হইলেন না। স্বদেশী আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস যদিও একধাপ অগ্রসর হইয়াছে তথাপি কার্যতঃ ইহা বিশেষ কিছু করে নাই। যুবকদের মধ্যে কংগ্রেস নরম

দল বলিয়াই পরিচিত ছিল, কারণ কংগ্রেসের কাজ ছিল বৎসরে একবার অধিবেশন আর কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করা। এই সময় একদল লোক ছিলেন, যাঁহারা বলিতেন, জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত লড়াই চলে না। বিশেষতঃ ইংরেজ আমাদের কত উপকার করিয়াছে—ইংরেজ রাজত্বে আমরা কত সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছি। তাঁহাদের দৃষ্টিতে—যাহারা স্বাধীনতার কথা বলে তাহারা পাগলের মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, ইহাদের মাথা খারাপ হইয়াছে, উইয়ের পাখা গজাইলে যে অবস্থা হয় ইহাদেরও সেই অবস্থা হইবে। তাই এই শ্রেণীর লোকের কাছে কংগ্রেস যাহা করিত তাহা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। বাংলা দেশে তখন একদল যুবক ছিল, যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব কম, তথাপি তাহারা সত্য-সত্যই দেশের স্বাধীনতার কল্পনা করিত। ঐ বিকৃত মস্তিষ্কদের মধ্যেই তাহাদের স্থান ছিল। গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতি তাহাদের নিরাশ বা ভীত করিতে পারে নাই। বিদ্যাবত্তার ছাপ তাহাদের বেশী ছিল না, অর্থবল তাহাদের মোটেই ছিল না, জনসমাজেও তাহারা ছিল অপরিচিত। কিন্তু সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ইহারাই তখন প্রকৃত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইল। সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় প্রকাশ্যভাবে কিছু করিবার উপায় ছিল না, অগত্যা গুপ্ত-সমিতির উদ্ভব হইল।

আমি জেল হইতে মুক্ত হইয়া বাড়ী যাওয়ার পর কয়েকদিন বাড়ীতে বেশ আদর-যত্নেই ছিলাম; কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়া আমার সহ্য হইল না, মন ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। সমিতির সভ্যদের সংবাদ এতদিন পাই নাই, সমিতির বোর্ডিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পুলিনবাবু নির্বাসিত, দলের বন্ধুগণ কে-কোথায় আছেন, আমি কিছুই জানি না। আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বাড়ীতে বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে, আমার বড়দাদা আমাকে রেঙ্গুন পাঠাইতে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি সেখানে আমার চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমার বিবাহ বা চাকুরী কোনটাই মনঃপূত হইল না, আমি চাই সমিতির কাজে আত্ম-নিয়োগ করিতে। আমাকে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে অধিকদিন কাটাইতে হয় নাই, একদিন সমিতি

হইতে সংবাদ আসিল, আমাকে ঢাকা যাইতে হইবে ; এই সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমার নেতারা আমার কথা ভুলেন নাই, আমার ডাক পড়িয়াছে, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। এখন প্রশ্ন এই, আমি বাড়ী হইতে কি করিয়া রওনা হই ? আমার যাইতে হইবে বাড়ী হইতে পলাইয়া, আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। বাড়ী হইতে অনুমতি চাহিলে অনুমতি পাওয়া যাইবে না। এখন উপায় কি ? একদিন সুযোগ মিলিল। আমার মেজদাদা এক আত্মীয় বাড়ীতে গেলেন, তিনি যাওয়ার সময় সিন্দুকের চাবি আমার নিকট রাখিয়া গেলেন ; আমি এখন বাড়ীর কর্তা। বাড়ীতে আমার পিসীমা, মেজবৌদি ও ছোটবৌদি ছিলেন। আমার পিসীমা বিধবা ছিলেন, তিনি আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন এবং তিনিই আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন। আমার ছোটবৌদিও বিধবা ছিলেন। আমি স্থির করিলাম আগামীকল্য বাড়ী হইতে পলায়ন করিব।

আমাদের বাড়ী হইতে ঢাকা যাইতে তখন ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ যাইতে হইত, ষ্টীমার স্টেশন আমাদের বাড়ী হইতে তিন মাইল দূর। ষ্টীমার প্রাতে ৮।৯ টার সময় ছাড়িত। পরদিন প্রাতে আমি বৌদিকে বলিলাম, আমার বাজিতপুর কিছু কাজ আছে, আমি এখন বাজিতপুর যাইব, কিছু খাইতে দিন। বাজিতপুর আমাদের গ্রাম হইতে তিন মাইল দূর। তখন অম্বুবাচী ছিল। বাজিতপুরের নাম শুনিয়া আমার পিসীমা কিছু আম কিনিয়া আনার ফরমাস্ করিলেন। আমার ছোটবৌদি এবং পিসীমা অম্বুবাচীর উপবাসী ছিলেন। আম আনার সংবাদে আমি মনে মনে খুবই ব্যথিত হইলাম, কিন্তু কিছু প্রকাশ করার উপায় নাই। প্রকাশ হইলে বাড়ীতে হৈ-চৈ, কান্নাকাটি সুরু হইবে, সংবাদ পুলিশের কাছে পৌছিবে। আমার মেজ বধূঠাকুরাণী বলিলেন; গরম ভাত তিনি রান্না করিয়া দিবেন, কিন্তু গরম ভাত খাইলে ষ্টীমার ধরা যাইবে না। তাই বলিলাম, আমার এখনই যাইতে হইবে, যাহা কিছু আছে দিন। তিনি বলিলেন, কিছু পান্তা ভাত আছে, কিন্তু তরকারী নাই। আমি তাড়াতাড়ি লেবু পাতা ও লংকা লইয়া খাইতে বসিলাম।

আমি পান্তা ভাত খাইয়া রওয়ানা হইলাম। আমাদের গ্রামের সতীশরায়ের নিকট পূর্বেই একখানা ধুতি ও একটি তোয়ালে রাখিয়াছিলাম। আমি সিন্দুক হইতে পাঁচ টাকা সঙ্গে লইলাম এবং জমাখরচের খাতায় লিখিলাম, 'আমি পাঁচ টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে।' সতীশ নির্দিষ্ট স্থানে আমাকে কাপড় ও তোয়ালে দিল। আমি তাহার নিকট চাবির গোছা দিয়া বলিলাম, তুমি সন্ধ্যার সময় চাবি বৌদির নিকট দিয়া বলিবে, আমি সমিতির কাজে গিয়াছি। বাড়ী ফিরিতে কিছুদিন বিলম্ব হইবে। হৈ-চৈ হইলে, বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। আমি সতীশকে বলিলাম, তুমি আগামীকল্য বৌদির নিকট হইতে টাকা লইয়া বাজিতপুর হইতে কিছু আম কিনিয়া পিসীমাকে দিবে।

সতীশ যখন বৌদির নিকট চাবি দিল আমি তখন ষ্টীমারে। বাড়ীতে কান্নাকাটি সুরু হইল। আমি ঢাকা যাইয়া কি করিব, সেই চিন্তায় মগ্ন রহিলাম। সেইদিন রাত্রে আমি ঢাকা যাইয়া স্বদেশী-যুগের নেতা ললিতবাবুর বাসায় উঠিলাম। আমি ললিতবাবুর বিদ্যালয়ের ছাত্র, তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন। ললিতবাবু স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানী খুলিয়াছিলেন, তিনি আমাকে ষ্টীমারে রাখিলেন। আমি ষ্টীমারে টিকিট বিক্রি করিতাম। টিকিট বিক্রয়ের টাকা ললিতবাবুর বাসায় অথবা জয়গোবিন্দবাবুর (রায় চৌধুরী) নারায়ণগঞ্জের গদিতে জমা দিতাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ চালানোর কাজও শিখিতাম, বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় স্বদেশী কোম্পানী পারিয়া উঠিল না। আমি কয়েকমাস ষ্টীমারে থাকার পর সমিতির কাজে মন দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষকতা

১৯০৯ সনে আমি পলাতক অবস্থায় একগ্রামে তিন মাস শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি। একবার সমিতির কাজে আমি মাণিকগঞ্জে গিয়াছিলাম। মাণিকগঞ্জের নিকট গড়পাড়াগ্রামের অশ্বিনী ঘোষ সমিতির সভ্য ছিল। অশ্বিনী জমিদার-পুত্র, তাহার পিতা জীবিত ছিলেন না। কাকা সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহাদের বাড়ীর উপরেই একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মাইনর স্কুল) ছিল। বেতনের অভাবে শিক্ষকগণ চলিয়া গিয়াছিলেন, শুধু দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন,—উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে আসিত না। এখানে সমিতির একটি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে অশ্বিনীকে বলিলাম, যে কয়েকজন শিক্ষকের প্রয়োজন আমি ঢাকা হইতে আনাইয়া দিব এবং সম্প্রতি আমি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ করিব। অশ্বিনী আনন্দের সহিত রাজী হইল এবং আমাকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহার কাকাকে বলিল, "আমাদের স্কুলের জন্য একজন খুব ভাল 'হেড্‌মাষ্টার' আনিয়াছি। তিনি মোক্তারবাবুর পরিচিত। চাকুরির অনুসন্ধানে মোক্তারবাবুর বাসায় আসিয়াছিলেন।" মোক্তার শ্রীযুক্ত রজনী বসাকের আমি পরিচিত শুনিয়া তিনি আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। আমি গড়পাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম, আমার খোরাকির ব্যবস্থা জমিদার বাড়ীতে হইল। নূতন হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছে, শুনিতে পাইয়া আবার ছাত্ররা বিদ্যালয়ে আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথম শ্রেণীতে একটি ছাত্র ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৫।২০টি। মোট ৬০।৭০ জন ছাত্র ছিল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রটি একটু নির্বোধ ছিল এবং প্রায়ই বিদ্যালয়ে আসিত না। আমার পক্ষে ইহা ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া বোধ হইল, কারণ মাইনর ক্লাসের অঙ্ক কষানো আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আমি যখন স্কুলে পড়িতাম তখন ইংরেজী ও ইতিহাসে প্রথম হইতাম, কিন্তু অঙ্কে বেশী নম্বর পাইতাম না, কোনও রকমে পাশ করিয়া যাইতাম। একদিন আমি ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি অঙ্ক করে। সে দেখাইয়া দিলে আমি তাহাকে একটি অঙ্ক দিলাম। সে যদি আমাকে বুঝাইয়া দিতে বলিত তবে আমি নিশ্চয়ই পারিতাম না। কিন্তু সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, তুমি নিতান্ত নির্বোধ, কিছুই বোঝ না, প্রথম হইতে অঙ্ক কর। ইহাতে সেও রক্ষা পাইল, আমিও রক্ষা পাইলাম। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল আমার প্রিয় ক্লাস। আমি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াইতাম, পণ্ডিত-মহাশয় পঞ্চম শ্রেণী হইতে পড়াইতেন। আমি যখন ইতিহাস পড়াইতাম তখন যাহা ইচ্ছা আমি বলিয়া যাইতাম। বিদ্যালয়ে আমি ছিলাম সর্বে-সর্বা, সেখানে আমার উপরে কথা বলিবার কেহ ছিল না।

তখন ছিল বর্ষাকাল। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম আগামী কল্য বিদ্যালয়-পরিদর্শক বিদ্যালয়ে আসিবেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি মনে-মনে ভীত হইয়া পড়িলাম। কে আসিবেন তাহার খবর পাই নাই, ভাবিলাম যদি সাহেব [illegible] তবে সেও আমার কথা বুঝিবে না, আমিও তাহার কথা বুঝিব না। পরে [illegible] বোস আসিতেছেন শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। আমি [illegible] বাড়ীর নৌকা পাঠাইয়া প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ীতে আগামী [illegible] উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ পাঠাইলাম। পরদিন আমার নৌকা পাঠাইয়া [illegible]দিগকে আনাইলাম, প্রায় একশত ছাত্র উপস্থিত হইল। [illegible] কা হয় নাই, কিন্তু আমি প্রায় সকলকেই 'উপস্থিত' চিহ্নিত [illegible] ছাত্রকে তাহা বলিয়াও দিলাম। আমি যখন মাইনর [illegible] [illegible]র আসার দিন পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে বই [illegible] দিয়াছিলেন এবং প্রত্যেককে ২।৩টা বানান ভুল [illegible] বাবু আমাদের স্লেট দেখিয়া তাহা [illegible] সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আমিও তৃতীয়

শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিলাম। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি টেবিলের উপর কতকগুলি শ্লেট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইগুলি কি?" আমি বলিলাম "শ্রুতিলিখন" (dictation) দিয়াছিলাম। তিনি শ্লেটগুলি পড়িয়া দেখিলেন কেহই বিশেষ ভুল করে নাই। মহিমবাবু ছিলেন একজন পাকা ঘুঘু। তিনি সন্দেহ করিলেন এবং ছাত্রদিগকে আবার শ্রুতিলিখন দিলেন। সে যাত্রা প্রত্যেক ছাত্র ১৫।২০টা বানান ভুল করিল। মহিমবাবু আমার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' আমি খুব লজ্জিত হইলাম, উত্তর দিতে পারিলাম না। তৎপর তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইয়া হাজিরা বহি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং হঠাৎ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাল বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলে?" সে বলিল, কাল তাহার বাড়ীতে কাজ ছিল সেজন্য সে কাল বিদ্যালয়ে আসে নাই। আমি তাহাকে 'উপস্থিত' করিয়াছিলাম। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। আমি আরও লজ্জিত হইলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে একটি অঙ্ক কষিতে দিলেন। তখন আমার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল ও পা কাঁপিতে লাগিল। আমার মনে হইল, এই অঙ্কটি সে কিছুতেই কষিতে পারিবে না—এখন যদি ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু আমাকে এই অঙ্কটা বুঝাইয়া দিতে বলেন, তবে আমার সমস্ত বিদ্যা ধরা পড়িবে। মনে মনে আমি তখন কালী, দুর্গা, শিব, কত নামই যে জপ করিতে লাগিলাম! এই সময় জমিদার বাড়ীতে খাবার ঘণ্টা পড়িল। মহিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এটা কিসের ঘণ্টা?" তখন প্রায় বেলা দেড়টা। বলিলাম, "খাবার ঘণ্টা।" আমার খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে খাইতে পাঠাইলেন, আমিও কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইলাম। মহিমবাবু বিদ্যালয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেতন কিছু পান কি?". উত্তর করিলাম, "হ্যাঁ. কিছু পাই!" তিনি বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার মনে হয় আপনি যদি বাড়ীতে বসিয়া শুধু শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খান তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা ইহা অপেক্ষা

অধিক পাইবেন।" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। যাহা হউক, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা ফল ভালই করিল। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু প্রত্যেক শ্রেণীতেই গেলেন। বিদায় লইবার সময় ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু তাঁহার মন্তব্যে লিখিয়া গেলেন, বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব খারাপ, মাত্র দুইজন শিক্ষক আছেন। তিন দিনের হাজিরা একদিন ডাকা হইয়াছে এবং তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল—ভুল। বিদ্যালয়ের অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয় তবে সরকারী সাহায্য বন্ধ হইবে।—অবশ্যই ইহার কিছুদিন পর উপযুক্ত শিক্ষক আসিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের অবস্থাও খুব উন্নত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পলাতক অবস্থা

একটা জাতির অন্তরে যখন স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগে তখন অত্যাচার নির্যাতন দ্বারা তাহাকে কখনও দাবাইয়া রাখা যায় না। স্বদেশী আন্দোলন যদিও গভর্ণমেণ্ট আইনের বলে দমন করিয়া দিয়াছিলেন, লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদিও ক্ষণকালের জন্য নির্বাপিত হইয়াছিল—তথাপি স্বাধীনতার সত্যকার আন্দোলন কখনও মরে নাই—ভিতরে ভিতরে ইহার আগুণ জ্বলিতেছিল। ইহা এখন নূতনরূপ ধারণ করিল ও বিপ্লব আকারে প্রকাশ পাইল। এই যুগকে তাই 'বিপ্লব-যুগ' বলা যাইতে পারে। এই সময় চারিদিকে পিস্তলের গুলি চলিতে লাগিল, স্থানে-স্থানে বোমা ফাটিতে লাগিল। পুলিশ বলিল, এ সব বিপ্লবীদের কাণ্ড। বিপ্লবীদলের লোকেরা যায়গায় যায়গায় ধৃত হইতে লাগিল। পুলিশ তাহাদের উপর মারপিঠ করিতে লাগিল। বিপ্লবীদের জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসী হইতে লাগিল। জেলের ভিতরেও তাহাদের উপর নির্যাতন চলিতে লাগিল। ফলে সেখানেও জেল আইন ভঙ্গ করিয়া বিপ্লবীরা দণ্ডভোগ করিতে লাগিল—অনশতব্রত গ্রহণ করিল। জেলে কতলোক জীবন হারাইল, কত লোক পাগল হইল, কত লোকের স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য ভগ্ন হইল।

ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলায় বিবাদীপক্ষের ব্যারিষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। তিনি তখন দেশবন্ধু নামে খ্যাত হ'ন নাই। এই মামলা উপলক্ষে আমরা তাঁহার সহিত পরিচিত হই। নরেনবাবু (সেন) মামলার তদ্বির করিতেন এবং দাশ মহাশয়ের সহিত প্রায়ই দেখা করিতেন। একদিন নরেনবাবু দাশ মহাশয়কে সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে দাশ মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'আমি এখন জেলে যাইতে প্রস্তুত নই।' সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন, নেতৃত্ব করিতে হইলে দেশের জন্য যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া

কাজে নামাই সঙ্গত। তাই তিনি তখন রাজী হন নাই,—হয়তো ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। দেশবন্ধু যদিও সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন নাই, তথাপি আমরা তাঁহার উপদেশ, সাহায্য ও সহানুভূতি সর্বদা পাইয়া আসিয়াছি। এই মামলা প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল। এই মামলার আসামীগণকে জেল হইতে কোর্টে লইয়া আসা এবং কোর্ট হইতে জেলে লইয়া যাইবার সময় এক বিরাট শোভাযাত্রা হইত। আসামীরা খোলা গাড়ীতে থাকিত আর প্রায় দুইশত বন্দুকধারী পুলিশ গাড়ীগুলি ঘেরিয়া কুচ-কাওয়াজ করিয়া যাইত। সঙ্গে সঙ্গে বহু দর্শক এবং গুপ্তচর থাকিত। আমি এই মোকদ্দমার পলাতক আসামী ছিলাম। আমার নামে পুরস্কার ঘোষণা ছিল। আমি কিন্তু মাঝে-মাঝে এই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া আসামীদের সহিত ইসারায় কথাবার্তা কহিতাম। একদিন ললিতবাবু আমাকে দেখিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "মরতে এসেছ ?" অপরে কেহই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। আমি শুধু বুঝিলাম যে তিনি আমাকে উদ্দেশ করিয়াই কথাটি বলিলেন। ইহার পর হইতে আমি আর তাঁহাদের সঙ্গে যাই নাই।

একবার পুলিশের তাড়া খাইয়া আমি ৮৫ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গিয়াছিলাম এবং রাস্তায় শুধু তিন পয়সার ছোলা ভাজা খাইয়াছিলাম। রাস্তাঘাট চিনিতাম না, মাঠ দিয়া চলিতে-চলিতে এক বড় রাস্তায় উঠিলাম। একটি রাখাল ছেলেকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'এই রাস্তা কোথায় গিয়াছে ?' সে এক বাজারের নাম করিল। পলাতক আসামী, তাড়া খাওয়ায় রেল-ষ্টীমারের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়াছি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ও সাধারণ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। সঙ্গে একটা টাকা ও পাঁচটি পয়সা ছিল। মনে করিলাম টাকাটি বিপদের সম্বল রাখিব আর শুধু খাওয়ার জন্য বাকী পাঁচটি পয়সা খরচ করিব। প্রথম দিন এক পয়সার ছোলা ভাজা খাইলাম; দ্বিতীয় দিন দুই পয়সার ছোলা ভাজা খাইলাম। খেয়া পার হইতে বাকি দুই পয়সা খরচ হইয়া গেল। তৃতীয় দিন বৈকালে প্রায় তিনটার সময় মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত তিল্লীগ্রামে শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়

মহাশয়ের বাড়ী গিয়া পৌঁছাই। যোগেন্দ্রবাবু গ্রামের মাইনর-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে অনেক স্বদেশী-লোক যাইত এবং তাহাদের অনুসন্ধানে পুলিসের লোকও যাইত। যোগেন্দ্রবাবুর মা আমাকে বসিতে বলিয়া স্কুলে যাইয়া যোগেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, 'তোমার নিকট একটি লোক আসিয়াছে। তাহাকে স্বদেশী লোক বলিয়াও মনে হইল না, পুলিশের লোক বলিয়াও মনে হইল না। মুখ শুকনো, চুল রুক্ষ, কতকটা পাগলের মত মনে হইল।—যোগেন্দ্রবাবু বাড়ী আসিয়া আমাকে দেখিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তাঁহার নিকট সকল ঘটনা বলিলাম। আমার কাপড় খানা ময়লা ও ছেঁড়া ছিল, বদলাইয়া তিনি একখানা ভাল পরিষ্কার কাপড় দিলেন। আমিও স্নান করিয়া খাইতে বসিলাম। সেখানে দুই-তিন দিন বিশ্রাম করিলাম। যোগেন্দ্রবাবু ফরমাইস দিয়া তিল্লীর বিখ্যাত 'চন্দনচূড়' দই খাওয়াইলেন। আমি চলিয়া যাইবার সময় আমার ছেঁড়া কাপড়খানা সেখানেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। এই ঘটনার পর বহু বৎসর যোগেনবাবুর সহিত দেখা হয় নাই। প্রায় ১৮ বৎসর পর ১৯২৯ সনে, সংবাদ পাইলাম যোগেনবাবু আমার সেই পরিত্যক্ত কাপড়খানা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন এবং তিনি আমাকে দেখিতে চান। তখন তিনি এক জমিদারের কাছারিতে নায়েব ছিলেন। একদিন ময়মনসিং সহর হইতে মোটরগাড়ীতে আমি যোগেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে মোটর দুর্ঘটনা হওয়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। ইহার পর নানা কাজে ব্যস্ত থাকি ও ধৃত হইয়া জেলে যাই। ইহার পর ১৯৩৮ সনে জেল হইতে মুক্ত হইয়া সংবাদ পাইলাম যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সহিত আমার আর এ-জীবনে দেখা হইল না।

আমি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলাম। আগড়তলার অন্তর্গত উদয়পুর পাহাড়ে আমাদের একটা কৃষি ফার্ম ছিল, একটা পাশ করা দোনালা গাদাবন্দুক ছিল। আমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া থাকিতাম। আমাদের ফার্ম কুমিল্লা সহর হইতে ৩২ মাইল দূরে ছিল এবং হাঁটিয়া যাইতে হইত।

একবার সেখানে আমার জ্বর হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ জ্বরে ভুগি। শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইল এখানে আর বেশীদিন থাকিলে নীচে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। এইখানে মরিতে হইবে। আমি কুমিল্লা যাইতে মনস্থ করিলাম। বাগুকে বলিলাম "কাল প্রাতে আমি কুমিল্লা যাইব। তুমি ভোরে উঠিয়া আমার জন্য আলুসিদ্ধ ভাত রান্না করিও।" সেখানে সতীশ বলিয়া একটি বি. এস. সি ছাত্র কিছুদিন যাবৎ ছিল। আমি সতীশকে বলিলাম আমার সহিত যাইতে হইবে। বাগু শেষরাত্রে উঠিয়া আমার জন্য ভাত পাক করিয়াছে! আমি ঘুম হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে বসিলাম—সতীশও খাইল। আমি এতদিন সাবু খাইয়াছি, জ্বর সারে নাই। আজও জ্বর ছিল। জ্বরের মধ্যেই আলুসিদ্ধভাত পেট ভরিয়া খাইয়া কুমিল্লার দিকে রওনা হইলাম, সতীশ সঙ্গে চলিল। রৌদ্র যতই উঠিতেছে জ্বর ততই বাড়িতেছে। আমিও চলিতেছি, কিন্তু পা যেন আর চলিতে চাহে না। ঘন ঘন পিপাসা পায়। এরূপ ভাবে চলিতে চলিতে ১০।১২ মাইল দূর এক বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বাজারে আমি পেট ভরিয়া দই চিঁড়া খাইলাম, সতীশ দই চিঁড়া খাইল, আবার রওয়ানা হইলাম। দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর ছিল, তাহার উপর পাহাড়িয়া রাস্তা। চড়াই উৎরাই করিয়া চলিতে হয়। উপরে উঠিবার সময় পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে—পিপাসা লাগিয়াই আছে। জল সব সময়ে পাওয়া যায় না। আমি কতকটা অজ্ঞান অবস্থায় চলিতে থাকিলাম—কিছুদূর গিয়া কোন গাছের নীচে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলাম "জল"। সতীশ আমাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। জল সব সময়ে যেমন পাওয়া যায় না, তেমনই জলের কোন পাত্রও আমাদের সঙ্গে ছিল না। সতীশ পাহাড়িয়া নদীর জল গামছা ভিজাইয়া আনিয়া আমার মুখে নিংড়াইয়া দিত। কোন কোন সময়ে জল আনিতে আনিতে গামছা যাইত শুকাইয়া, আমার মুখে শুধু কয়েক ফোঁটা জল পড়িত। দুই-একবার পাহাড়িয়াদের বাড়ী হইতে লোটা সংগ্রহ করিয়া জল আনিয়াও খাওয়াইয়াছে। জল খাই আবার চলি, রাস্তায় বেশী দেরীও করিতে পারি না, বাঘের ভয় আছে।

সন্ধ্যার দিকে মনে হইল জ্বর কমিয়া গিয়াছে কিন্তু শরীর খুব দুর্বল। অবশেষে রাত্রি ৯টার সময় আমরা কুমিল্লা গিয়া রমেশ ব্যানার্জীর বাসায় পৌঁছি। রমেশবাবুর দাদা একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখনও জ্বর একশ ডিগ্রী আছে। রাত্রে দুধ-পাঁউরুটিও খাইলাম, ঔষধও খাইলাম। পরদিন প্রাতে ৯৯° জ্বর লইয়া ঢাকা রওনা হইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় ঢাকা পৌঁছিয়া আমার জ্বর সারিয়া গেল।

আজকাল সকলেই দেশের স্বাধীনতার কথা বলে—কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, মুসলীম লীগ, রায়-সাহেব, খানসাহেব, জমিদার, তালুকদার, কৃষক, মজুর,—সকলেই চাহেন দেশের স্বাধীনতা। কিন্তু বিপ্লবযুগে দেশের যে-অবস্থা ছিল তাহাতে কেহ স্বাধীনতার দাবীর কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহসী হইতেন না। আমরাও প্রকাশ্যভাবে দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতাম না। মামলা-মোকদ্দমায় শুধু সরকারী সাক্ষীদের মুখে প্রকাশ পাইত যে আমরা দেশের স্বাধীনতা চাই এবং দেশকে স্বাধীন করারই চেষ্টা করিতেছি। আমরা কোন ছেলেকে দলে আনিবার সময় প্রথমেই তাহাকে দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতাম না। প্রথমতঃ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র ভাল কি না, তারপর তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহাকে ধর্ম-পুস্তক পড়িতে দিতাম—পরে পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, রাজপুত কাহিনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতি পড়িতে দিতাম। সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার কথাও আলোচনা করিতাম। এইরূপ ভাবে তাহার মন গড়িয়া তুলিয়া পরে তাহাকে দেশের স্বাধীনতার কথা বলা হইত। স্বাধীনতার কথা শুনিয়া আবার অনেক ছেলে বিপদের আশংকায় নিকটে আসিত না। এমন কি কোন কোন ছেলে তাহার অভিভাবককে বলিয়া দিয়াছে—আবার সেই অভিভাবক বিপদাশংকা করিয়া পুলিশে সংবাদ দিয়াছে। পুলিশ তখন 'স্বদেশীর গন্ধ' পাইয়া তিলকে তাল করিয়া মামলা বাধাইবার চেষ্টা করিত ও সেই লোকটির উপর নির্যাতন করিত। সেই সময় আমরা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দিতাম না, কারণ যেখানে স্বাধীনতার কথা উঠিবে না,

শুধু আবেদন-নিবেদনের উচ্ছাস প্রকাশ পাইবে সেখানে যাওয়া আমরা, বৃথা সময় নষ্ট, মনে করিতাম। অবশ্যই দেশের সাধারণের ভিতর জাগৃতি আনিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু তখন প্রত্যক্ষ কোন সুবিধা ছিল না। জনসাধারণের ভিতর প্রবেশ করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই, তবে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা গঠন করিয়া শিক্ষাবিস্তার ও স্বদেশী প্রচারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। স্থানে স্থানে পাঠশালার পাশাপাশি পাঠাগার ও 'আশ্রম' স্থাপন করিয়াছি। ঐ আশ্রম আর স্কুল ছিল আমাদের এক একটি কেন্দ্র।

পলাতক অবস্থায় আমাকে নানাস্থানে নানাভাবে থাকিতে হইয়াছে। কখনও মাঝি, কখনও চাকর বা কুলি, কখনও বড়লোক সাজিয়াছি। যখন আমাদিগকে নৌকায় থাকিতে হইয়াছে তখন নৌকায় আমরা মাঝির বেশে মাঝির মতোই থাকিতাম। পূর্ববঙ্গে বহু ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা বড় ঘাসী নৌকা ব্যবহার করিত। আমাদেরও বড় ঘাসী-নৌকা ছিল, আমরা নিজেরাই নৌকা চালাইতাম। স্বদেশী ডাকাত ধরার জন্য তখন জল-পুলিশের ব্যবস্থা ছিল, স্থানে স্থানে জল-পুলিশের আড্ডা ছিল, পুলিশের দল প্রত্যেক নৌকা থামাইয়া অনুসন্ধান করিত। পুলিশ-লঞ্চ নদীর সর্বত্র-ঘোরাফেরা করিত। আমাদের পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন নদীতে চলাফিরা করিতে হইত, জল-পুলিসের আড্ডার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হইত। সময় সময় পুলিশ-লঞ্চের সহিতও দেখা হইত; বড় ঘাসী নৌকার উপর পুলিশের নজর ছিল অধিক, তাই আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। এক যাত্রায় আমাদের নৌকা এক বাজারে লাগাইয়াছি, ঘাসী-নৌকা দেখিয়া কিছু লোকের সন্দেহ হইয়াছে, আমাকে থানায় ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি দারোগাবাবুর সকল প্রশ্নের জবাব দিলাম, আমার কথাবার্তা চালচলনে কাহারও কোন সন্দেহ-হইল না। দারোগাবাবুর মফঃস্বলে এক তদন্তে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাইতে রাজী আছি কি না। আমি বলি, কেরায়া বাই, রাজী হইব না কেন?—আমার নৌকা ছিল খালি। দারোগার সহিত কনষ্টব্‌ল্ যাইবে, কয়েকটা বন্দুক থাকিবে, ইচ্ছা করিলে

বন্দুকগুলির মালিক আমিও হইতে পারি। আমি রাজী হইলাম। রাজী না হইয়াও উপায় নাই। তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিবে। আমাকে সন্দেহক্রমে আটক করিয়া যদি আমার বাড়ীঘরের অনুসন্ধান করে, তবে সেই গ্রামে সেই নামের কোন লোক পাইবে না, আমার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে, আমি তখন পলাতক আসামী। আমার নামে পুরস্কার ঘোষণা ছিল। ঘটনাক্রমে দারোগাবাবুর অন্য একটি বিশেষ কাজ থাকায় মফঃস্বল যাওয়া হয় নাই। আমি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া, হাটে বাজার করিয়া গন্তব্য পথে রওয়ানা হইলাম। আমি কোন কোন স্থলে নিজেকে আইনের ছাত্র বা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর ছাত্র বলিয়াও পরিচয় দিয়াছি। এক সময়ে আমি কালীচরণ মাঝি নামে খ্যাত ছিলাম। আমি বহুদিন নৌকায় নৌকায় কাটাইয়াছি, নৌকায় থাকিতে থাকিতে চেহারাও মাঝির মতো হইয়া গিয়াছিল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রং খুব ফর্সা ছিল, দেখিতে রাজপুত্রের মতো। কিন্তু রৌদ্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার চেহারাও মাঝির মতো হইযাছিল। মাঝিরা যেভাবে থাকিত আমরাও সেইভাবে থাকিতাম। আমরা মাটির শানকীতে ভাত খাইয়াছি। কল্কি দিয়া তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত অভ্যাস কবিযাছি। আমি পূর্ববঙ্গের সমস্ত বড বড় নদীতে নৌকা চালাইয়াছি, বর্ষাকালে ঝড-বৃষ্টির দিনে পদ্মা নদী পাড়ি দিযাছি, বরিশালে গিয়াছি, নোযাখালি গিয়াছি, জাহাজের সঙ্গে পাল্লা ধরিয়া নৌকা চালাইয়াছি। পুলিশের হাতে বহুবার আমাকে পডিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আমাকে সাধারণ গ্রাম্য মাঝি ভাবিয়া ছাডিয়া দিয়াছে। অবশ্য কোন কোন সময় সেলামও দিতে হইয়াছে। সেই যুগে আমি পুলিশ কর্মচারীদের নিকট খুব ভীষণ প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আমাদেব গ্রামের লোক যাহারা শৈশব হইতে আমাকে জানে, তাহারা জানে আমি খুব শান্ত প্রকৃতির লোক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয়বার জেল-দর্শন

আমি ১৯১২ সনে ঢাকা সহরে এক খুনের মামলায় ধৃত হই। পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় একজন পুলিশ কর্মচারীকে রিভলভার দ্বারা গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে—পরদিন প্রাতে আমি সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম। পুলিশ কর্মচারী অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন হঠাৎ আমি তাহাদের সম্মুখে পড়িলাম। চলিয়া যাইতেছি, এমন সময় ইন্স্‌পেক্টরবাবু আমাকে ডাকিলেন। তিনি পূর্বে নাকি রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তির সহিত আমাকে নদীর পাড়ের পার্কে দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হত্যাকাণ্ডের সময় যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা বলিয়াছে, হত্যাকারীর লম্বা দাড়ি ছিল—আর ঘটনাক্রমে আমারও লম্বা দাড়ি ছিল। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়াইলাম। আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, একটা নাম বলিয়া দিলাম। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থানায় যাইতে বলিলেন। বাধ্য হইয়া আমাকে থানায় যাইতে হইল। আমার সঙ্গে একটি 'হুইস্‌ল্‌' ছিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, গ্রামের ফুটবল খেলার জন্য কিনিয়াছি। কোথা হইতে কিনিয়াছি? জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, নারায়ণগঞ্জ হইতে। অতঃপর কোন্ দোকান হইতে 'হুইসেল' কিনিয়াছি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে নারায়ণগঞ্জ লইয়া চলিল। বাঁশীটি আমি বহু পূর্বে কিনিয়াছিলাম, সুতরাং নারায়ণগঞ্জ গিয়া 'কোন্ দোকান' ভুলিয়া গেলাম। পুলিশ পূর্ব হইতেই সন্দেহ করিতেছিল, এখন বুঝিল, আমি সত্য কথা বলি নাই। অতঃপর আমি কে, এই অনুসন্ধান চলিলে প্রকাশ পাইল, আমি ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী।

আমি এখন ঢাকা জেলে আছি। চারি বৎসর পর আবার ঢাকা জেলের সাক্ষাৎ পাইলাম। খুনী-মামলার আসামী, বিশেষতঃ পুলিশ কর্মচারী খুন,

কাজেই আমার প্রতি ব্যবস্থা খুব কড়াকড়ি। বিশ ডিগ্রী 'সেলে' আছি, রাত্রে দুই ঘণ্টা পর পাহারা বদল হয়, নূতন সিপাহী 'চার্জ' লওয়ার সময় অর্থাৎ প্রত্যেক দুই ঘণ্টা পর পর আমাকে জাগাইয়া দেখে আমি 'সেলে' আছি কিনা। পুলিশের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পূর্বে আরো কয়েকটা হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে বলিয়াছে হত্যাকারীর লম্বা দাড়ি ছিল। পুলিশ এখন প্রত্যেক স্থান হইতে লোক আনাইয়া আমার দাড়ি মাপিয়া দেখিতে লাগিল—এই দাড়ি সেই দাড়ি কিনা। সকলেই এক বাক্যে বলিল, এ সে নয়। ঢাকার 'প্রত্যক্ষ-দর্শীরা'ও আমাকে সনাক্ত করিল না, কাজেই আমার বিরুদ্ধে খুনের মামলা চলিল না। পুলিশ তখন বিফল মনোরথ হইয়া আমার বিরুদ্ধে ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলা চালাইতে স্থির করিল—কিন্তু সরকার তাহাতে রাজী হইল না। ষড়যন্ত্র মামলা চালাইতে হইলে বহু টাকা ব্যয় হইবে, পূর্বের সমস্ত সাক্ষীকেই ডাকিতে হইবে, বিশেষতঃ পূর্বের মামলায় ললিতবাবু, যদু, বিনোদ খালাস পাইয়াছে, পুলিনবাবুর হাইকোর্টে মাত্র সাত বৎসর জেল হইয়াছে—আমাকে আটকাইতে পারিবে কি না তারও কোন স্থিরতা নাই। কাজেই সরকার আমার নামে আর ষড়যন্ত্র মামলা চালাইলেন না। তখন পুলিশ আমার বিরুদ্ধে অগতির গতি ১০৯ ধারা চালাইল। ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট রায় সাহেব যামিনীমোহন দাস মহাশয়ের আদালতে আমার বিচার আরম্ভ হইল, কিন্তু মামলা চলিল না। কয়েক মাস হাজত ভোগ করিবার পর আমি বে-কসুর খালাস পাইলাম।

এ যাত্রা বহু গুপ্তচর আমাকে চিনিয়াছে—পুলিশ আমার ফটো তুলিয়া রাখিয়াছে। আমি এখন সর্বদা পুলিশের চোখের উপর আছি। আমার ধৃত হওয়ার পর আমার মেজদা মোকদ্দমার তদবির করিতে ঢাকা আসিয়াছিলেন। খালাসের পর তিনি আমাকে বাড়ী লইয়া চলিলেন। সেই যে পান্তা ভাত খাইয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া ছিলাম, তাহার তিন বৎসর পর আজ বাড়ী ফিরিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয়বার বাড়ী হইতে অন্তর্ধান

আমি দশ বার দিন বাড়ীতে ছিলাম। কয়েক জন গুপ্তচর আমাদের গ্রামে থাকিয়া আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিত। আমি একদিন বাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইলাম। এ যাত্রা পলাইতে হইল পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম।

গুপ্তচর যখন টের পাইল আমি বাড়ীতে নাই তখন তাহারা চারিদিকে তার করিয়া দিল। পুলিশ চারিদিকে আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি তখন ঢাকার দিকে রওনা হইয়াছি এবং দুইদিন পর নির্বিঘ্নে ঢাকায় পৌছিয়াছি। আমার পক্ষে তখন পূর্ববঙ্গে থাকা অসম্ভব ছিল। কারণ গুপ্তচরেরা সকলেই আমাকে চিনিয়াছে। আমি বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তরবঙ্গে চলিলাম।

সমিতি ক্রমে উত্তরবঙ্গে সর্বত্র বিস্তার লাভ করিল। আমি উত্তরবঙ্গে বিরজাবাবু নামে পরিচিত ছিলাম। আমার কুষ্টিতে অপর নাম ছিল বিরজা। পুলিশ ইহা জানিত না। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাস্থানে কাটাইতাম। একবার আমি বহরমপুর হইতে মালদহ যাই। বহরমপুর কলেজের বি, এ, শ্রেণীর একটি ছাত্র আমাদের সভ্য ছিল, তাহার বাড়ী ছিল মালদহ শহরে। মালদহে আমাদের দল ছিল না। সে বাড়ী যাইতেছিল, আমি তাহার সঙ্গী হইলাম। তাহার পিতা, কাকা ও দাদা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ও সরকারী কর্মচারী, রাস্তায় ট্রেনে সে আমাকে বলিল, "আপনার সহিত আমার যে পরিচয় আছে তাহা বাসায় প্রকাশ করিবেন না।" আমি তাহাকে বলিলাম, "তবে তোমাদের বাসায় কি করিয়া উঠিব?" সে বলিল "বলিবেন শহর দেখিতে আসিয়াছেন, ট্রেনে আপনার সহিত

আমার পরিচয়। আপনার উঠিবার কোন জায়গা নাই, তাই আমার সঙ্গে আসিয়াছেন।" তাহার বাবা ও দাদা আমায় খুব আদর যত্ন করিলেন। আমি দুই তিন দিন তাহাদের বাসায় ছিলাম। তাহার দাদা একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। প্রকৃতি ছিল তাঁহার ধর্মপরায়ণ। দু-একদিনের মধ্যেই আমি তাঁহার সহিত ধর্মকথা বলিয়া ভাব করিয়া লইলাম। আমি যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলাম, "আমার একটি বন্ধু, বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ, এখানে চাকুরীর সন্ধানে আসিবে। আপনাদের বাসায় অনেকগুলি ছেলে-পিলে আছে, তাহাকে যদি আপনি আপনাদের বাসায় স্থান দেন তবে সে ছেলেদের পড়াইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর চেষ্টা করিতে পারিবে।" তিনি বলিলেন, "টাকা পয়সা বিশেষ কিছু দিতে পারিব না।" আমি তাহাতেই রাজী হইয়া গেলাম। একজন গৃহশিক্ষক পাঠানোর জন্য ঢাকাতে চিঠি লিখিলাম,—কিছুদিন পর পূর্ণ চক্রবর্তী আসিয়া হাজির হইল। পূর্ণ লেখাপড়া বিশেষ জানিত না। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী কিছু শিখিয়াছিল। আমি একখানা চিঠি দিয়া পূর্ণকে মালদহে পাঠাইলাম, পূর্ণ সেই বাড়ীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল। পূর্ণর এখন সমূহ বিপদ উপস্থিত—সে ছেলেদিগকে পড়াইতে পারে না—ভুল পড়ায়। পূর্ণ আমাকে পুনঃপুনঃ চিঠি দিতে লাগিল, তাহাকে অন্যস্থানে বদ্‌লি করিতে, কিন্তু আমি আদেশ দিলাম তাহাকে সেইখানেই থাকিতে হইবে। পূর্ণ যদিও পড়াইতে পারিত না ও তাহার বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি সে নিজের চরিত্রগুণে সকলের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। বাড়ীর কর্ত্রীঠাকুরাণী পূর্ণকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন। পূর্ণকে এখন তাড়ায় কে? পূর্ণ এখন সেই বাড়ীর একজন হইয়া পড়িল। বাড়ীর কর্তা মনে করিতেন পূর্ণ নাই বা পড়াইতে পারিল—শুধু নিকটে বসিয়া থাকিলে ছেলেরা দুষ্টামী করিবে না, বিশেষতঃ পূর্ণের জন্য কোন পৃথক খরচ হয় না; কিন্তু তাহার দ্বারা কাজ হয় অনেক। সুবিধা পাইয়া পূর্ণ এখন আস্তে আস্তে দল গড়িতে লাগিল। মালদহে এক সাধু ছিল এবং সেই সাধুর কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র শিষ্য ছিল। পূর্ণ সেই দলে ভিড়িয়া সাধু এবং

বি, এ, পাশ, আই, এ, পাশ শিক্ষকদের সহিত তর্ক করিয়া তাহাদিগকে তাহার পথে টানিয়া আনিল—তাহারাই হইলেন এখন পূর্ণের সহায়ক। পূর্ণ বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকেও দলভুক্ত করিল। গ্রামেও সমিতির শাখা বিস্তৃত হইল। কিছুদিন পর আমি মালদহে গিয়া দেখিলাম, পূর্ণ বেশ দল গঠন করিয়াছে। আমি পূর্ণকে ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, এখন মালদহের কাজ ইহারাই চালাইতে পারিবে। তুমি পূর্বে আমার নিকট চিঠি লিখিয়াছিলে, তোমাকে মালদহ হইতে বদ্‌লি করিতে, এখন তোমাকে অন্যত্র পাঠাইব।" পূর্ণ বলিল, "আমি মালদহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব না।" বুঝিলাম মালদহের প্রতি পূর্ণের মায়া জন্মিয়াছে। পূর্ণ আরও কিছুদিন সেখানে ছিল, পরে কুমিল্লা জেলার ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে যায়। পূর্ণ বহু বৎসর জেলে আটক ছিল। জেল হইতে মুক্ত হইয়া সে বিবাহ করে। যক্ষ্মা রোগে কিছুকাল পর মারা যায়।

বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশেও ধীরে ধীরে সমিতি বিস্তার লাভ করিল। সমিতির শাখা বাংলার বাহিরে আসাম, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বোম্বাইতে ছিল। বাংলা দেশ হইতে লোক যাইয়া সেই সব প্রদেশেও দল গঠন করাইয়াছিল। চন্দননগরে একটি দল ছিল। মতিবাবু ছিলেন তাঁহার নেতা এবং শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও রাসবিহারী বোস সেই দলের প্রধান কর্মী ছিলেন। আমাদের সমিতির সহিত চন্দননগরের দল এক হইয়া যায়। ইহার পর রাসবিহারীবাবু অধিকাংশ সময়ে উত্তর ভারতে থাকিতেন। কাশীতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যালের একটি দল ছিল, সেই দলও আমাদের সমিতির সহিত এক হইয়া যায়। এই সময়ে শচীনবাবু রাসবিহারীবাবুর সহিত পরিচিত হন। এদিকে আমেরিকাতে 'গদর-পার্টি' বলিয়া একটী দল ছিল, তাহাদের একখানা সংবাদ-পত্র ছিল, তাহার নাম ছিল 'গদর'। প্রথম জার্মান-যুদ্ধ সুরু হইবার পর জার্মান 'কন্‌সাল' তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এখানে কি করিতেছ? তোমরা ভারতবর্ষে গিয়া তোমাদের দেশ স্বাধীন করিবার চেষ্টা কর—জার্মান গভর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। তাহারা আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাসবিহারীবাবুর সহিত মিলিলেন।

এই ভাবে একদিকে যেমন সমিতি দিনের পর দিন চারিদিকে বিস্তার লাভ করিতেছিল অপর দিকে আবার তেমনি ভাঙ্গনও সুরু হইল। এই সময়ে অনবরত ধর-পাকড় চলিতে ছিল—অস্ত্র আইনে, ডাকাতির মামলায়, খুনের মামলায়, ১০৯।১০ ধারায়, বোমার মামলায়, ষড়যন্ত্রের মামলায় বহুলোক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে লাগিল। এই সব মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির আমাদিগকে করিতে হইত এবং ইহাতে আমাদের অনেক শক্তিরও অপব্যয় হইত। আত্মীয়-স্বজনেরা ভয়ে কেহ নিকটে আসিতেন না। কাজেই মোকদ্দমার সমস্ত দায়িত্ব আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইত। ১৯১২।১৩ সনে আমাদের মধ্যে অনেকের মনে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন উঠিল। একদল লোক বলিতে লাগিলেন আমাদিগকে অহিংসার পথে চলিতে হইবে—হিংসার পথে যাইয়া আমাদের কোন লাভ হইবে না, ইহার দ্বারা আমাদের শক্তির অপব্যয় হইতেছে ও হইবে। হিংসা ও অহিংসার এই দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে কিছুদিন ব্যাপিয়া বেশ চলিল—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইতিহাস ও দর্শন হইতেও উহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি তর্ক চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই মীমাংসার পথ আগাইল না। সময় সময় এরূপ হইয়াছে যে তর্ক করিতে করিতে আমরা সারারাত্রি কাটাইয়া দিয়াছি। সূর্যের আলো দেখিয়া তবেই মনে হইয়াছে সারারাত্রি তর্ক করিয়াছি—ঘুমের কথা বিস্মৃত হইয়াছি। যাহা হউক, অবশেষে ইহাকে ভিত্তি করিয়া একদল লোক সরিয়া পড়িলেন। অবশ্যই তাহারা অহিংস-ভাবে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন না। অনেকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জনে মন দিলেন। অবশিষ্ট কিছু লোক, যাঁহারা সরল বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিলেন না কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন। যাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই বেশ নাম করিয়াছেন। হিংসা ও অহিংসার এই দ্বন্দ্ব হইতে কিছু লোক যেমনি সরিয়া পড়িলেন, তেমনই কিছু লোক আবার বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া বা বিভিন্ন মতলব হইতে সরিয়া পড়িয়া ভিন্ন দল করিলেন। ফলে বাংলা দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইল।

এদিকে বিখ্যাত রাজাবাজার বোমার মামলা সুরু হইয়াছে। এই মামলার প্রধান আসামী ছিলেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল হাজরা। তিনি শশাংক হাজ্‌রা নামেও পরিচিত ছিলেন; বাংলার প্রসিদ্ধ বাহ্রা ডাকাতি সম্পর্কে তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ছিল। পুলিশ দীর্ঘকাল তাঁহার কোন সন্ধান পায় নাই, তিনি কলিকাতায় এক বরফের কারখানায় কাজ করিতেন। এই মামলায় ৺চন্দ্রশেখর দে প্রভৃতিও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে অমৃতবাবুর ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। শশাংকবাবুর বাসায় খানা-তল্লাসী করিয়া পুলিশ এরূপ কতকগুলি জিনিষ পাইয়াছিল যাহার ফলে তাহারা মনে করিল বাসাটি বোমার কারখানা। পুলিশ বলিতে লাগিল, যেসব জিনিষ তাহারা পাইয়াছে, তাহা বোমার 'সেল'। কিন্তু শশাংকবাবু বলিলেন ইহা বোমার 'সেল', নহে, নূতন ধরণের গ্যাস-লাইট তিনি আবিষ্কার করিতেছেন। এইগুলি হইতেছে তাহার খোল। তিনি একদিন প্রকাশ্য আদালতে বোমার 'সেল' 'গ্যাস-লাইটে' রূপান্তরিত করিয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্যাস লাইটের যুক্তি টিকিল না, তিনি বোমার মামলায় দণ্ডিত হইলেন। এই মামলা উপলক্ষে পুলিশ বহুস্থানে খানা-তল্লাসী করে এবং এক জায়গায় বিরজা নামের একখানা চিঠি পায়। বিরজা তখন কলিকাতায়ই ছিল কিন্তু পুলিশ তাহার কোন সন্ধান পায় নাই। সিডিসন-কমিটি রিপোর্টে দেখা যায় ভারতবর্ষে যে সব স্থানে বোমা পাওয়া গিয়াছে তাহা দুই প্রকারের। একটা আলীপুর টাইপ এবং অপরটা রাজাবাজার টাইপ। আলীপুর টাইপ, যাহা বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলার সময় পাওয়া গিয়াছিল এবং যে মামলায় বারীণবাবু প্রভৃতি দণ্ডিত হইয়াছিলেন,—তাহা অল্প কয়েক জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। রাজাবাজার টাইপ বড়লাটের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া মৌলবী বাজার পর্যন্ত বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। রাজাবাজার টাইপ পুলিশ মনে করিত অনুশীলন সমিতির।

বিপ্লবীদের বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হয়, তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয় ভাবী বিপ্লবে কোন কোন রাষ্ট্র তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের যখন সম্ভাবনা দেখা দিল তখন অনুশীলন সমিতির নেতারা ১৯১৩ সনে একজন বিপ্লবীকে গোপনে জার্মেনীতে পাঠাইল। সেই তরুণ বিপ্লবী এক বৎসর জার্মেনীতে ছিল এবং বিশ্ব যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্বে তিনি আমেরিকায় চলিয়া যান। ইহার পর জার্মান যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বিপ্লবী বিদেশে যান।

আমি এখন শয্যাশায়ী, আমার কাশী হাঁপানীতে পরিণত হইয়াছে, কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন ইহা যক্ষ্মারোগ। আমার বন্ধুরা অনবরত সেবা, শুশ্রূষা করিতেছে। প্রত্যহ—দিনের পর দিন, হয়তো মায়ের কাছেও এমন যত্ন মিলে না। আমি মনে মনে খুব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, মনে করিতেছি আমি সমিতির একটা গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছি। সময় সময় বন্ধুদের নিকট প্রস্তাব করিয়াছি একটা কিছু করিয়া মরি। কিন্তু বন্ধুরা আমাকে মরিতে দিবে না, আমাকে বাঁচাইবেই। গৌরবময় মৃত্যু আমার অদৃষ্টে নাই। আমার অদৃষ্টে আছে কষ্ট ভোগ, তাই মৃত্যু আমার হইল না;—মাঝে মাঝে যমের দক্ষিণ দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ তখন কলিকাতায় ছাত্র ছিলেন। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় ফুস্‌ফুসের ব্যাধির বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নলিনীবাবু মল্লিক মহাশয়ের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাই তিনি অল্প টাকায় তাঁহার দ্বারা আমার বুক পরীক্ষা করাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, নলিনীবাবুর পরিচিত আরও দুই একজন চিকিৎসক আমাকে দেখিয়াছিলেন। একদিন আমাকে পরীক্ষা করাইবার জন্য মল্লিক মহাশয়ের বাসায় গিয়াছি। সেইদিন ছাত্রদেরও পরীক্ষা ছিল, তাঁহার নির্দেশানুসারে সকল ছাত্রই আমাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। ছাত্রদের পরীক্ষা ও প্রশ্নবাণে আমার প্রাণান্ত উপস্থিত কিন্তু ছাত্রেরা আমাকে ছাড়িবে না—আমিও কিছু বলিতে পারি না। কারণ, একে ইহা ভদ্রতা বিরুদ্ধ হইবে, দ্বিতীয়তঃ আমি মল্লিক মহাশয়ের অনুগ্রহপ্রার্থী। আমি তো টাকা দিই না। কিছুদিন চিকিৎসা চলিল, কিন্তু কোন লাভ হইল না। অবশেষে ডাক্তাররা বলিলেন, সমুদ্রের তীরে বায়ু

পরিবর্তন করিতে যাইতে হইবে। বন্ধুরা স্থির করিলেন আমাকে পুরীতে যাইয়া থাকিতে হইবে। দিন স্থির হইল—রাস্তায় attendent হিসাবে নলিনীবাবু আমার সঙ্গে চলিলেন। সেবা-শুশ্রূষার জন্য আরও দুইজন সঙ্গী চলিল। কিন্তু পুরীতে আমার কোন উপকার হইল না বরং রোগবৃদ্ধি পাইল। সেখানকার এক ডাক্তার আমাকে ভুবনেশ্বর যাইতে বলিলেন। আমি ভুবনেশ্বর গেলাম। ভুবনেশ্বরেও আমার কোন উপকার হইল না, কিছুদিন থাকিবার পর সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

বঙ্গভঙ্গ রদ হইল কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনের গতি থামিল না, একদিন বড়লাটের উপর বোমা পড়িল। বিপ্লবীদের সহিত নেতাদের কোন কার্যকরী সম্বন্ধ ছিলনা। নেতারা তাহাদের উপর গালিবর্ষন করিয়া আসিয়াছেন। বিপ্লবীরাও তাঁহাদের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতেন না। স্বদেশী নেতারা কেহ ছিলেন স্বার্থপর, কেহ অতিরিক্ত বিবেচক। আগে চলার সাহস ও ক্ষমতা তাঁহাদের ছিলনা যদিও তাঁহারা ছিলেন খুব প্রতিভাশালী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধনী। যুবকের দল ছিল নির্ভিক, নিঃস্বার্থপর। তাহারা চাহিত আগে চলিতে —নেতাদের ছিলনা এই আগে চলিবার সাহস, তাই তাঁহারা অচিরেই সরিয়া পড়িলেন। আগে চলিতে গেলে বিপদ আছে, তাই নেতারা চলিলেন নিরাপদ পথে আর যুবকেরা চলিল বিপদসংকুল পথে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়াই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল—নেতাদের আশা আকাঙ্ক্ষাও বঙ্গভঙ্গ রদ ও সামান্য কিছু শাসন সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুবকদের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক প্রসারিত—তাহারা চাহিত পূর্ণ স্বাধীনতা। যুবকেরা জানিত পূর্ণ স্বাধীনতা আবেদন-নিবেদনে আসিবেনা—দুই একটা শাসন সংস্কারের মধ্য দিয়া সে পূর্ণ স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত হইবার নয়। তাই প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহারা চলিয়াছে পূর্ণ স্বাধীনতার কণ্টকময় পথে।

পুলিনবাবু ধৃত হইলে পর যাঁহারা বিপ্লব আন্দোলন চালাইয়াছেন তাঁহাদের সকলেই ছিলেন অল্প বয়স্ক যুবক এবং স্কুল কলেজের ছাত্র। এই সকল অল্প

বয়স্ক যুবকদের স্কন্ধে যখন দায়িত্বভার চাপিয়াছে তখন তাহাদের প্রতিভা ও কর্মশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই সব কর্মীদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই সকলের নিকট নেতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। পুলিনবাবুর পর সমিতির একক নেতৃত্ব ছিলনা, কোন 'কমিটি' ছিলনা, কোন নির্বাচনও হইত না। যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁহারাই নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইতেন। তখন কাহাকে পরামর্শ সভায় ডাকা হইল কি কাহাকে পরামর্শ সভায় ডাকা হইল না ইহা লইয়া কেহ অভিমান করিতেন না। রাসবিহারীবাবু পাঞ্জাবে থাকিয়া মনে করিতেন তিনি যাহা কিছু করিতেছেন আমরা তাহা অনুমোদন করিব এবং আমরাও ভাবিতাম আমরা যাহা কিছু করিতেছি তিনি তাহা অনুমোদন করিবেন। আমাদের পরস্পরের মধ্যে একাত্মভাব ছিল, তাই বড় ছোটর কোনদিন কোন প্রশ্ন আসে নাই—যখন যাহার সহিত দেখা হইয়াছে পরামর্শ করিয়াছি। সেদিন আমরা বলিতে পারিতাম আমরা সকলেই নেতা অথবা আমাদের মধ্যে কোন নেতাই নাই—আমরা সকলেই কর্ম্মী। ইহাও বলিতে পারিতাম আমাদের মধ্যে একজন নেতা—প্রয়োজন হইলে আমাদের মধ্য হইতে যেকোন একজনকে নেতা বলিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিতে পারিতাম। মনের কোনে আমাদের সকলেরই সুর ছিল এক—বেসুরা আওয়াজ কোনদিন আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই—যেন আমরা ছিলাম সকলেই একটি সূত্রে গাঁথা। রাসবিহারীবাবু যখন চন্দননগরে থাকিতেন তখন প্রায়ই তিনি আমাদের কলিকাতার আড্ডায় আসিতেন, আমরাও মাঝে মাঝে চন্দননগরে যাইতাম। সমিতির নেতারা প্রত্যেকেই ছোট হইতে দক্ষতা দেখাইয়া বড় হইয়াছেন। প্রথমতঃ প্রত্যেককেই বাড়ীঘর ছাড়িয়া গ্রামে বা মফঃস্বলের কোন ক্ষুদ্র সহরে বসিতে হইয়াছে। সেই সব স্থানে থাকিয়া যাঁহারা কর্মের দ্বারা প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই আস্তে আস্তে প্রধান কেন্দ্রে স্থান পাইয়াছেন—তাঁহারাই সকলের নিকট নেতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। একদল লোক যখন ধরা পড়িয়াছেন, অপর দল লোক তখন

এইভাবেই তাহাদের স্থান পূরণ করিয়াছেন—কোন ব্যক্তি বিশেষের অভাবের জন্য কোন কাজের ক্ষতি হয় নাই।

আমরা খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতাম। কলিকাতা সহরে আমাদের বাসাভাড়ার জন্য ৩।৪ টাকার বেশী খরচ হইত না। খাবারও ছিল অতি সাধারণ—সকালে মুড়ি, দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে ডাল-ভাত অথবা মাছের ঝোল ভাত। কোন কোন দিন আমাদের দুইটি তরকারিও হইত আবার কোন কোন দিন সম্পূর্ণ উপবাসেও থাকিতে হইত। আমাদের বাসায় কোনো আস্‌বাব্ থাকিত না—আস্‌বাবের মধ্যে থাকিত বিছানা, তাহাও অতি সাধারণ। বাসার সমস্ত কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম। আমি একবার হবিগঞ্জে গিয়াছিলাম। সেখানকার ভার অনুকূল চক্রবর্তীর উপর ছিল। সেখানে শুনিলাম সে রাত্রে মাত্র এক পয়সার ছাতু খাইয়া এক ঘটি জল খায়। আমরা কখনও থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতে যাইতাম না। একবার আমার কয়েকজন সহকর্মী এবং বন্ধু থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন আমি সেজন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলাম। তাঁহারা নিজেরা পয়সা খরচ করিয়া থিয়েটারে যান নাই—এক ভদ্রলোক কয়েকখানা পাশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তিনি খুব আগ্রহ করিয়া তাঁহাদের থিয়েটারে লইয়া গিয়াছিলেন। একদিন থিয়েটার দেখিলে চরিত্র নষ্ট হইবে ইহা আমি মনে করি না। কিন্তু আমরা যদি বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখি তবে দলের লোকেরা থিয়েটার পয়সা খরচ করিয়া দেখিবে—তখন তাহাদের কিছু বলিতে পারিব না। সকলে মনে করিবে ইহারা সমিতির টাকা থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া উড়ায়। আমাদের পান, তামাক, সিগারেট খরচও ছিল না। রাস্তায় আমাদের কুলির প্রয়োজনও হইত না—সাধারণতঃ পায়ে হাঁটিয়াই চলাফেরা করিতাম। কলিকাতায় তখন 'বাস' ছিল না—বিশেষ জরুরী কাজ না থাকিলে ট্রামেও উঠিতাম না। শ্যামবাজার হইতে কালীঘাট সাধারণতঃ আমরা হাঁটিয়াই যাইতাম। আমি শৈশবে গ্রাম্য-থিয়েটার ও যাত্রা দেখিয়াছি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থিয়েটার দেখি নাই। জীবনে একবার বায়স্কোপ ও একবার টকী দেখিয়াছি। আমি যখন ১৯১২ সনে

প্রথম কলিকাতা যাই তখন শশাংকবাবু দুই আনা খরচ করিয়া বায়স্কোপ দেখাইয়া ছিলেন, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে তখন বায়স্কোপ ঘর ছিল। ইহার ২৬ বৎসর পর, ১৯৩৮ সনে রাজসাহী হইতে নওগাঁ যাই, সঙ্গে রাজসাহীর কংগ্রেস নেতা ৺সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয় ছিলেন। আমরা নওগাঁর কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রজনী সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীতে উঠি। রজনীবাবুর একটি সবাক-চিত্রগৃহ ছিল। আমি পূর্বে শুনিয়াছি 'ছবি কথা বলে,' এইজন্য আমার সবাক-চিত্র দেখিবার মনে মনে ইচ্ছা ছিল। নওগাঁ আসিয়া এই ইচ্ছা পূরণ হইল—রজনীবাবুর অনুরোধে আমরা সবাক চিত্র দেখিতে গেলাম।

একসময়ে আমাদের হাত দিয়া হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়াছে, নিজেদের ভোগবিলাসীতার জন্য তাহা হইতে একটি টাকাও খরচ করি নাই। আমাদের সাধারণতঃ একটা জামার বেশী দুইটা জামা থাকিত না। জামাকাপড় আমরা ধোপা বাড়ী দিতাম না, নিজেরাই জামা কাপড় পরিস্কার করিতাম। একবার শীতকালে আমি স্থির করিলাম একটি গরম কোট কিনিব। তখন আমার কাসি হইতে ছিল, দোকানে গিয়া সস্তা গরম কোটের অনুসন্ধান করিলাম। দোকানে ইঁদুরে কাটা অনেকগুলি তালি দেওয়া কোট ছিল। আমি তাহারই একটি কম দামে কিনিয়া আনিলাম। অসুখবিসুখ হইলে আমরা সাবু-বার্লির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতাম, ডাক্তারের ধার বিশেষ ধারিতাম না। অবস্থা খারাপ হইলে একমাত্র ডাক্তারের নিকট যাইতাম। ৺খগেন চৌধুরীর পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে, পেটে প্লীহা হইয়াছে। অনেক কুইনাইন সেবন করিতেছেন কিন্তু কোন উপকার হইতেছে না। খগেনবাবুকে একদিন ডাঃ ওয়াই, এম, বোসের নিকটে লইয়া গেলাম। আমি পূর্বে কলিকাতা স্বাস্থ্যনিবাসে তাহারই চিকিৎসাধীনে ছিলাম। তিনি খগেনবাবুকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার 'বড়ির' ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধ তাঁহার ডাক্তারখানা হইতেই ক্রয় করিলাম এবং ফিরিবার সময় একটি টাকা তাহাকে দর্শনী দিলাম। তিনি টাকাটা ফিরৎ দিলেন। আমি বলিলাম, "আমরা খুব গরীব।" তিনি বলিলেন, "আপনাদিগকে দর্শনীর টাকা দিতে হইবে না, যখন প্রয়োজন হয়

আমাদের নিকট আসিবেন।" আমরা তখন কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করিয়া টাকা ফিরৎ লইয়া আসিলাম—তখন আমাদের হাতে টাকা ছিল না। যাহোক, খগেনবাবু এই 'বড়ি' খাইয়াই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

সমিতির সভ্যদিগকে প্রধাণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যাহারা দেশ সেবার জন্য বাড়ীঘর ছাড়িয়াছেন তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই শ্রেণীর অনেকেই বিভিন্ন মামলার পলাতক আসামী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাজের সুবিধার জন্য নিজবাড়ীতে থাকিতেন কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে বাড়ীঘর ছাড়িতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন সাধারণ সভ্যেরা। ইঁহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ আশা করা যাইত যে প্রয়োজন হইলে তাঁহারাও বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিবেন। ইঁহারা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সভ্য ছিলেন যাঁহারা ছিলেন সংসারী এবং বাড়ীঘরে থাকিয়া বিপদের সম্মুখীন না হইয়া যতটা পারিতেন সাহায্য করিতেন। আমাদের বহু বাড়ীঘর ছাড়া সভ্য ছিল। উৎসাহী সভ্যদিগকে প্রথমতঃ বাড়ীঘর ছাড়াইয়া গ্রামে বসাইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছিল সভ্যদের প্রথম পরীক্ষা। অনেক উৎসাহী সভ্য দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, বাড়ী ছাড়িবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত কিন্তু দেখা গিয়াছে গ্রামে থাকিবার কিছুদিন পর তাহাদের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। তাহারা বাড়ী ছাড়িয়াছে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতে—সম্ভবতঃ তাহারা ভাবিয়াছে—স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব শেষ হইয়াছে। তাহারা এখন ঘোড়ায় চড়িয়া, রাইফেল কাঁধে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে, কিন্তু কার্যতঃ দেখিতেছে সেরূপ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহাকে পাঠান হইয়াছে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে—এখানে সকলেই অশিক্ষিত, শিক্ষিত লোকের বাস এখানে নাই, সে কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারিছে না, সে রান্না জানেনা অথচ তাহাকে রান্না করিয়া খাইতে হইতেছে। তাহাকে পাঠশালার পণ্ডিতি করিতে হইতেছে—গ্রামের লোকদিগকে সে যাহা বলিতে চাহে তাহারা তাহা এতটুকুও বোঝে না। এই প্রকার পরীক্ষায় যাহারা টিঁকিয়াছে তাহাদের মধ্যে আবার অনেকে একবার জেলে গিয়া দ্বিতীয়বার জেলে যাইবার স্পৃহা

রাখে নাই—জেল হইতে ফিরিয়া খুব পিতৃমাতৃভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছিল সভ্যদের দ্বিতীয় পরীক্ষা।

সমিতির সভ্যেরা সাধারণতঃ চরিত্রবান ও ধর্মভাবাপন্ন ছিল। সেই যুগে কোন ছেলেকে উন্নত চরিত্র দেখিলে অভিভাবকগণ মনে করিতেন, সে নিশ্চয়ই সমিতির সভ্য হইয়াছে। ইহা মনে করিয়া তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িতেন। পুলিশও এই সংবাদ পাইয়া তাহার পিছনে লাগিত। অবশ্যই সময় সময় যে ইহার ব্যতিক্রম না ঘটিয়াছে তাহা নয়। কখন কখন কোন কোন সভ্যের চরিত্রদোষ দেখা গিয়াছে কিন্তু সে তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তও ভোগ করিয়াছে। আমরা ১৯১০ সনে মেয়ে-সভ্য করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম—কতকটা অগ্রসরও হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহার কুফল দেখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহার পর আমাদের সভ্যেরা তাহাদের মা, বোন এবং নিকট আত্মীয়াকে শুধু দলভুক্ত করিতে পারিত, অপরের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব থাকিত না। আমাদের মেয়ে-সভ্যের মধ্যে অনেকে অনেক সময় সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেই যুগে এরূপ একটা অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল যে কোন সহরে কোন যুবক বাড়ী ভাড়া করিতে পারিত না। বিপ্লবী দলের কর্মী বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করা হইত। এই সন্দেহ এড়াইবার জন্য কাহারও বৃদ্ধা মাকে আনিয়া বাসায় রাখা হইত এবং তিনি সকল ছেলেকেই নিজের ছেলের মত যত্ন করিতেন। পুলিস কখনও সন্দেহ করিয়া সেই বাসা ঘেরাও করিলে বৃদ্ধাকেও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

সমিতির সভ্যদের মধ্যে অনেকেই আর্থিক ত্যাগও স্বীকার করিয়াছেন। পুলিনবাবু নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সমিতির কাজে সেই টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পুলিনবাবুর ডিপোরটেশনের পর আশুবাবু যখন ভার গ্রহণ করিলেন তখন সমিতির খুব আর্থিক দুরবস্থা—বাড়ীঘর ছাড়া সভ্যেরা কখনও আলুসিদ্ধ ভাত খায় কখনও উপবাসে থাকে। আশুবাবুর বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না। আশুবাবুর স্ত্রীর এক হাজার টাকার সোনার গহনা ছিল। আশুবাবুর দৃষ্টি এই

গহনার উপর পড়িল। তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট এই গহনা চাহিলেন। মেয়েদের নিকট গহনা খুব প্রিয় জিনিস, তাহারা সহজে ইহা হস্তচ্যুত করিতে চাহে না। কিন্তু আশুবাবুর স্ত্রী কোন আপত্তি করেন নাই। সোনার অলংকারগুলি একখানি কাপড়ে বাঁধিয়া স্বামীর হাতে দিয়াছিলেন। আশুবাবুও ইহা বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ সমিতির কাজে ব্যয় করিয়া ছিলেন। নরেনবাবুও (সেন) যখনই সুযোগ পাইয়াছেন বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া সমিতির কাজে ব্যয় করিয়াছেন। ছেলেদের মধ্যেও অনেকে বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া দিয়াছে। ইহা ছাড়া সোনারং বোর্ডিংএ যখন অর্থাভাবে শিক্ষক ও ছাত্রেরা উপবাসী রহিয়াছে তখন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিজ নিজ বাড়ী হইতে কেহ মার কাছে চাহিয়া, কেহ বা চুরি করিয়া বাড়ীর চাউল, চিঁড়া, লাউ কুমড়া প্রভৃতি যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহাই আনিয়া দিয়াছে। তথাপি একদিকে যেমন ত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত আছে অপর দিকে তেমনি স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের হাতে যখন টাকা কড়ি আসিয়াছে তখন কোন কোন বিশ্বাসী গৃহী সভ্যের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি। কিন্তু এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে তাহার বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে—আমাদের গচ্ছিত অর্থ, তাহার নিজের টাকা পয়সা—এবং অলংকারও সব চোরে লইয়া গিয়াছে, তিনি এখন সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এবং আমাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি চুরির সংবাদ থানায় জানান নাই। অবশ্যই এরূপ ঘটনা খুব কম ঘটিয়াছে।

১৯১৪ সনের প্রথম ভাগে আমি ভুবনেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় এক সাধুর চিকিৎসাধীনে থাকি। সাধুটি একটি বাঙালী কুলীন ব্রাহ্মণ। ইনি স্বামী বালাজী মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। সাধুর চিকিৎসায় কিছু ভাল আছি। তাঁহার চিকিৎসার নিয়ম ছিল—প্রাতে—৯—১০ টার সময় একঘণ্টা সরিষার তৈল গায়ে মালিশ করিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া স্নান করিতে হইবে, অন্ততঃ ৫০।৬০টা ডুব দেওয়া চাই। বৈকালে গড়ের মাঠে গিয়া রোজ হাওয়া খাইতে হইবে। একদিন বৈকাল ৪টার সময় একা ইডেন-উদ্যানে বসিয়া আছি এমন সময় একটি গুপ্তচর আসিয়া আমার নিকট

বসিল। সে সম্ভবতঃ আমাকে একা নীরবে বসিতে দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিল তাই নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। যখন জানিতে পারিল যে আমার যক্ষ্মাকাশ হইয়াছে, এখানে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি এবং ২।৪ বার কাশিতেও দেখিল তখন সে একটু সরিয়া বসিল এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি বিবাহ করিয়াছি কিনা। আমি বলিলাম, বিবাহ তো একটা করি নাই, দুইটা করিয়াছি এবং দ্বিতীয় স্ত্রীটি নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমি আরও দুঃখ করিয়া বলিলাম, আমারত' সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন ভাবি ইহাদের কি উপায় হইবে। সে আমাকে খুব বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে বহু বিবাহ অন্যায়। আমিও উত্তর করিলাম অদৃষ্টের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারে না। অতঃপর সে চলিয়া গেল। গুপ্তচরটা জানিত না যে সে এতক্ষণ যাহার সহিত আলাপ করিতেছিল তাহার নামে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষনা আছে। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের খেলা।

১৯১৪ সনের প্রায় মাঝামাঝি জার্মান যুদ্ধ সুরু হইয়াছে, ইংলণ্ড এখন বিপন্ন। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নেতা এই বিপদে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বিপ্লবীরা ভাবিল ইহাই সুযোগ। এই সুযোগে কিছু না করিতে পারিলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ কঠিন হইবে—স্বাধীনতার বৈপ্লবীক প্রচেষ্টা হয়তো কিছু দিনের জন্য আবার স্তিমিত হইয়া পড়িবে। তাই সকলেই খুব কর্মঠ হইয়া উঠিলেন। রাসবিহারী, কর্তার সিং, ৺জোয়ালা সিং এবং অনুশীলন সমিতির আরও অনেকে উত্তর ভারতের সৈন্য বিগড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলায় আবধবিহারী ও আমীর চাঁদের ফাঁসী হইয়াছে এবং এই সূত্রে রাসবিহারীর নাম প্রকাশ পাইয়াছে। বড়লাটের উপর বোমা পড়ায় রাসবিহারীর নামে সরকার ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু 'নেটিভ-ষ্টেটের' রাজারাও পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। রাসবিহারীর নামে মোট ১ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। রাসবিহারী এখন পলাতক অবস্থায় কাজ চালাইতে থাকিলেন। বাংলা দেশে যাহারা বরিশাল ষড়যন্ত্র

মামলার পলাতক আসামী ছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহারা সকলেই ধরা পড়িয়াছেন। এখন আমার পালা। আমি এখনও সাধুর ঔষধ খাই এবং গঙ্গায় স্নান করি। কিন্তু সাধুর নিকট প্রত্যহ হাজিরা দিবার বিশেষ অবসর হয় না, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি। সাধুর ঔষধে বিশেষ যে ভাল হইয়াছি তাহা নয়, অসুখ মাঝে মাঝে খুব বৃদ্ধি পায়। মনে হয়, রাত্রি পার হইবে না। কিন্তু আবার কমিয়া যায়। আমি গঙ্গার ঘাটে একটি লোক, ঠিক করিয়া ছিলাম, তাহাকে প্রত্যহ তিনটি করিয়া পয়সা দিতাম সে আমাকে তেল মালিস করিয়া দিত। আমি হাঁটিয়াই স্নান করিতে যাইতাম, কিন্তু রাস্তায় তিন-চার বার বিশ্রাম করিতে হইত।

নবম পরিচ্ছেদ

তৃতীয়বার জেল-দর্শন

১৯১৪ সনের শেষভাগে একদিন আমি গঙ্গার ঘাটে বসিয়া তেল মালিশ করিতেছি, এমন সময় দেখি পুলিশের দারোগা বিশ্বাস মহাশয় আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন আমার এইরূপ অবস্থা যে দৌড় দিবারও ক্ষমতা নাই। মনে হইল এ যাত্রা আর রক্ষা পাইব না। দারোগাবাবু আমার নিকটে আসিয়া অতি সম্মানের সহিত পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়া গ্রেপ্তার করিলেন এবং একখানা গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া চলিলেন। সঙ্গে কয়েকজন কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ও ছিল। লালবাজার হাজতে আনিয়া আমাকে আটক করিলে আই. বির মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহুলোক আমাকে দেখিতে আসিল। এমনকি লোম্যান সাহেব, টেগার্ট সাহেবও আসিলেন। লোম্যান সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দারোগাবাবুকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অবশ্য আমাকে ধরিবার জন্য দারোগাবাবুর কোনই কৃতিত্ব ছিলনা। দারোগাবাবু আই. বি তে ছিলেন না। সাধারণ পুলিশ বিভাগে ঢাকায় চাকুরী করিতেন। আমাদের দলেরই পুরাণো একটি লোক আই. বিরব ড়কর্ত্তার নিকট আমার সংবাদ দিয়াছিল। লোকটি আমার বাসা চিনিত না—কিন্তু আমি যে সাধুর চিকিৎসাধীনে আছি এবং রোজ গঙ্গায় ডুবিয়া স্নান করি তাহা সে জানিত। তাহার সহিত আমাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, এই সময়ে সে আমাদের সংশ্রব প্রায় ত্যাগ করিয়াছে। আই. বির বড়কর্ত্তা এই গুপ্তচরটির নিকট আমার সংবাদ পাইয়া ঢাকা হইতে আমার পরিচিত পুলিসের দারোগা উক্ত বিশ্বাসকে আনাইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিলেন। গোয়েন্দা অপিসে সংবাদ দিয়াই গুপ্তচরটির সম্ভবতঃ একবার অনুতাপ হইয়াছিল অথবা আমার প্রতি তার দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল—তাই আমার সহিত দেখা করিতে ব্যস্ত

হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন তাহার সহিত রাস্তায় দেখাও হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল, কয়েকদিন হয় বিশ্বাস মহাশয় এখানে আসিয়াছেন। বিশ্বাস মহাশয় যে-বাসায় উঠিয়াছেন সেই বাসার ঠিকানাও সে আমাকে দিয়া গেল। আমি তাহাকে সন্দেহ করি নাই, সম্ভবতঃ সে নিজে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই ভয়েই আর বিশেষ কিছু বলে নাই শুধু সাবধান হইবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম বিশ্বাস মহাশয় যখন আই. বির লোক নহেন তখন নিশ্চয়ই অন্য কাজে আসিয়াছেন। এখন আমাকে একটু সাবধান থাকিলেই চলিবে। কিন্তু আমি যদি তখন কলিকাতা ছাড়িয়া যাই তবে আর ধরা পড়িনা। যাহা হউক, এখন আমার জবানবন্দী লইবার জন্য লোম্যান সাহেব আসিলেন, টেগার্ট সাহেব আসিলেন, আরও অনেকে আসিয়া অনেক প্রশ্ন করিতে থাকিলেন। আমি সকলকেই বলিলাম, "আমি কিছু বলিব না"। লোম্যান সাহেব বলিলেন—"আমি কয়েকটা প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর চাই।" এযাত্রা আমার সঙ্গে একটি চাবি ছিল। লোম্যান সাহেব চাবিটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি?" আমি—"চাবি।"

লো: কিসের চাবি?

আমি: তালার চাবি।

লো: কিসের তালা?

আমি: লোহার তালা।

লো: এই তালাটা কিসের জন্য ব্যবহার করিতে? ইহা কি দরজার তালা, না ট্রাঙ্কের?

আমি: ইহা দরজারও হইতে পারে, ট্রাঙ্কেরও হইতে পারে।

লো: তোমার জামা কোথায়?

আমি: জানিনা।

লো: অমৃত হাজারকে চিন?

আমি: আমি কি করিয়া তাহাকে চিনিব।

লো: তুমি তাহার বাসায় যাইতে?

আমি: কেন তাহার বাসায় যাইব? আমার উত্তর শুনিয়া লোম্যান সাহেব রাগে গর্‌গর করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি স্নান করিবার সময় ধৃত হই। কাজেই আমার সঙ্গে কাপড় জামা কিছুই ছিলনা, যাহা ছিল স্নানের ঘাটেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম—আমার তৈল মালিশ কারীর নিকটই তাহা রহিয়া গিয়াছিল। আমি এখন এক কাপড়ে আছি। একদিন লোম্যান সাহেবকে বলিলাম, আমার কাপড়-জামা নাই। তিনি সেইদিনই সাড়ে সাতটাকা খরচ করিয়া কাপড় জামা আনাইয়া দিলেন। পরদিন এক 'সার্জ্জেন্ট' আমাকে বলিল, "তুমি খুব ভাগ্যবান, লোম্যান সাহেব নিজের টাকা হইতে তোমার কাপড়-জামা কিনিয়া দিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিবার অভ্যাস আছে।"

লোম্যান সাহেব সকলের সহিত খুব মিশিতে পারিতেন। তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প করিতে আসিতেন। অবশ্য সব সময়েই তাঁর চেষ্টা থাকিত কথার ফাঁকে আমার কাছ হইতে কিছু বাহির করিতে পারেন কি না। একদিন তিনি বলিলেন, "তোমাদের বীরেন আমার হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।" আমার ধরা পড়িবার কিছুদিন পূর্বে, গ্রীয়ার পার্কে কয়েকজন পলাতক বিপ্লবী কর্মী পরামর্শ করিবার জন্য একত্র হয়। পুলিশ পূর্বে ইহার সংবাদ পাইয়াছিল। লোম্যান সাহেব নিজে পুলিশ বাহিনী লইয়া গ্রীয়ার পার্ক ঘেরাও করেন। বিপ্লবীরা পলাইবার চেষ্টা করিলে পুলিশের সহিত তাহাদের হাতাহাতি হয়। এই অবস্থায় লোম্যান সাহেবের সহিত বীরেন চ্যাটার্জ্জীর ধ্বস্তা ধ্বস্তি চলে। লোম্যান সাহেব বীরেনের আটগুণ জোয়ান ছিলেন। কিন্তু বীরেন কুস্তির প্যাঁচ জানিত। কুস্তির প্যাঁচ দিয়া সে লোম্যান সাহেবের হাতের কব্‌জা মচ্‌কাইয়া দিয়াছিল। আমি লোম্যান সাহেবকে বলিলাম, 'বীরেনকে থানায় লইয়া গিয়া পরে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।' লোম্যান সাহেব বলিলেন, 'নিশ্চয়ই না। বীরেনের সহিত যখন তোমার দেখা হইবে তখন জিজ্ঞাসা করিলেই তাহা জানিতে পারিবে।' তিনি আরও বলিলেন, 'তোমাদের কয়েকজন বাঙালী কর্মচারী আমাকে পরামর্শ দিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে। কিন্তু

আমি বলিয়াছিলাম : সে যেমন আমাকে মারিয়াছে আমিও তেমনই তাহাকে মারিয়াছি, সমান সমান হইয়াছে।' আমাদের বাঙালী পুলিস কর্মচারীরা সম্ভবতঃ ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, এতবড় একজন ইংরাজ কর্মচারীর উপর হাত উঠাইতে কেহ স্পর্দ্ধা রাখিতে পারে। তাঁহারা হয়ত সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানারূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন—তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে লোম্যান সাহেবের জন্ম পরাধীন দেশে হয় নাই, তিনি স্বাধীন দেশের লোক। তিনি আমার নিকট বীরেনের উচ্চ-প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বীরেন খুব সাহসী, তাহার গায়ে বেশ জোর আছে।" আমাদের দেশী কোন কর্মচারীকে কেহ প্রহার করিলে তিনি এই অপমান চিরকাল মনে রাখিতেন এবং প্রতিশোধ লইবার নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু লোম্যান সাহেব সেদিকে যান নাই, তিনি প্রকাশ্যভাবে বীরেনের সাহস এবং শক্তির প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন কত মারামারি করিয়াছি। যদি তুমি কখনও ইংলণ্ডে যাও দেখিবে ছাত্রেরা রাস্তায় ঘাটে কত মারামারি করিতেছে। তবে আমাদের মারামারি রাস্তাঘাটেই শেষ হয়, তোমাদের দেশে উহা অন্যরূপ। কাহারও সহিত বিবাদ হইলে পরে একদিন অন্ধকারে পিছন হইতে মাথায় বাড়ী মারিয়া সে পলাইয়া যাইবে।' এই খানেই স্বাধীন জাতির ও পরাধীন জাতির মনোভাবের পার্থক্য। আমাদের দেশেও এক সময় এইরূপ বীরের সম্মান ছিল—কিন্তু তখন ভারতবর্ষ ছিল স্বাধীন।

আমার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বন্দুকধারী সিপাহীসহ বরিশাল জেলে পাঠান হইল। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত রমেশ চৌধুরী শ্রীযুক্ত খগেন চৌধুরী ও আমার বিরুদ্ধে এখন বরিশাল (সাপ্লিমেণ্টারী) ষড়যন্ত্র মামলা চলিল। এই মোকদ্দমায় তিনজন "এ্যাপ্রুভার" হইয়াছিল এবং এক বৎসরের উপর মামলা চলিয়াছিল। সরকার পক্ষে এই মামলার দরুণ তিনলক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হয়। আমাদের পক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী ও উকীল ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিপক্ষের ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ এন, গুপ্ত, উকীল ছিলেন ফজলুল হক্ সাহেব ও বরিশালের অন্যান্য প্রধান প্রধান উকিলগণ। বরিশাল জেলে গুর্খা সিপাহী আমাদের পাহারা দিত। আমরা পাঁচজনই একত্র ছিলাম। জেলের আই, এম, এস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আমার হাঁপানী হইয়াছে। হাঁপানীর চিকিৎসা চলিল কিন্তু কোন ফল হইল না। এ্যাপ্রুভাররা বলিল আমি কালীচরণ, বিরজা, হরেন্দ্র প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলাম। এপ্রুভার ও সরকারী কর্মচারীদের সাক্ষ্য হইতে এবং বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী দ্বারা প্রাপ্ত বন্দুক, রিভলভার ও কাগজপত্র হইতে সরকারপক্ষ প্রমাণ করিলেন আমরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতে ছিলাম। বিচারক আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিয়া আমাকে ১৫ বৎসরের দ্বীপান্তর বাস এবং অপর চারিজনের প্রত্যেকের দশ বৎসর দ্বীপান্তর বাস দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। আমরা হাসিমুখেই কারাবরণ করিলাম। আদালত হইতে জেলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পায়ে শিক্‌লী-বেড়ি পরাইয়া দিল—কারণ আমাদের সাজা বেশী। সকলেই বলিল সেণ্ট্রাল জেলে গেলেই আমাদের বেড়ি কাটিয়া দিবে। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা বরিশাল জেল হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে চালান হইলাম। এযাত্রা পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়িবাঁধা। সঙ্গে বন্দুকধারী পাহারা আছে। আমরা পাঁচজনেই একসঙ্গে চলিলাম। রাস্তায় যেরূপ সুব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে বেশ একটু গর্বই বোধ হইল। আশা ছিল প্রেসিডেন্সী জেলে পৌছিলেই আমাদের বেড়ি খুলিয়া দিবে—কিন্তু দেখিলাম উল্টা ফল ফলিল। প্রেসিডেন্সী জেলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শিক্‌লী-বেড়ী (Link Fetters) কাটিয়া ডাণ্ডাবেড়ি পরাইয়া দিল এবং ৪৪ ডিগ্রীতে বন্ধ করিল।

শ্রীঅরবিন্দ এই ৪৪ ডিগ্রীতে কিছুদিন থাকিবার পর শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিলেন। এবং জেল হইতে মুক্ত হইয়া পরে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয়লাভ করিয়া অধ্যাত্মশক্তির উৎস সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ৪৪ ডিগ্রীর যেরূপ

ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সাধারণ লোক কিছুদিনের মধ্যেই চোখে সরিষার ফুল দেখিত। একবার মুক্তিলাভ করিলে আর বড় কেহ জেলে যাইবার নাম করিত না—বিপ্লবের পথই পরিত্যাগ করিত। ৪৪ ডিগ্রীকে নির্জন কারাবাস বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে সমস্ত দিনরাত্র আবদ্ধ থাকিতে হইত—কাহারও সহিত দেখা হইত না বা কাহারও সহিত কথা বলিবার উপায় ছিল না, দিনের মধ্যে একবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন মাত্র। আমাদিগকে চট সেলাইএর কাজ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা পাশাপাশি 'সেলে' থাকিয়াও পরস্পরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম না। কথা কহিবার জন্য আমাদের মাঝে মাঝে হাতকড়া সাজা হইয়াছে। আমাদের ভাতের মধ্যে ধান ও পাথর কোনটা বেশী ছিল বলা কঠিন। একদিন আমি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম—

"জেলার বেটা বড় খচ্চর
খেতে দেয় ধান আর পাথর···।"

তখন শীতকাল ছিল। আমি হাঁপানীর রোগী কিন্তু একখানা অতিরিক্ত কম্বল চাহিয়াও পাইলাম না। তাই আবার কবিতা লিখিলাম—

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড় পাজির পাজি,
বেশী কম্বল দিতে হয় না রাজী—।"

লিখিবার জন্য আমাদের কাগজ কলম কিছু ছিলনা—মুখে মুখেই কবিতা তৈয়ারী করিতে হইত এবং পরে চীৎকার করিয়া পরস্পরকে শুনাইতাম। প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কবিতা তৈয়ার করিতেন। আমাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, "—যদি মহারাজ···না আসিত।" কয়েক মাস আমাদের জাল ডিগ্রীতেও (জাল দিয়া ঘেরা cubicle) কাটাইতে হইয়াছিল।

লোম্যান সাহেব, টেগার্ট সাহেব প্রায় মাঝে মাঝেই প্রেসিডেন্সী জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। লোম্যান সাহেব একদিন আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন

করিলাম, তিনি যুদ্ধে যাইতেছেন না কেন? তিনি বলিলেন,—"আমি এবং মিঃ টেগার্ট যুদ্ধে যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইতেছি না। গভর্ণমেণ্টের হুকুম উচ্চকর্মচারীরা স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। অবশ্য আমরা এখনও চেষ্টা করিতেছি।" আমি বলিলাম, "যুদ্ধে গেলে আপনার মৃত্যু হইবে, আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে। আপনি মোটা বেতনের চাকুরী করিতেছেন। আপনি কেন যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যস্ত?" লোম্যান সাহেব একটু উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আজ যদি আমার কলেরায় মৃত্যু হয় তবে কে আমার স্ত্রী পুত্র দেখিবে? একদিন মরিতেই হইবে। যদি দেশের জন্য আমার মৃত্যু হয় তবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিব।" ইহাই তো খাঁটি দেশপ্রেম। আমার দেশ এখন বিপন্ন, এখন স্ত্রী-পুত্রের কথা ভাবিলে চলিবে না, প্রাণের মায়া করিলে চলিবে না, সর্বাগ্রে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীন দেশের লোককে ইহা শিখাইতে হয় না, যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে হয় না। তাঁহাদের ভিতর খাঁটি দেশপ্রেম আছে এবং এইজন্যই তাঁহারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন। স্বাধীনতাই দেশবাসীকে দেশপ্রেমিক করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখন আমাদের দেশেও দেশপ্রেমিকের অভাব ছিল না—সেদিন তাহারাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারিলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। আজ ভারতবর্ষ পরাধীন তাই আমরা স্বার্থপর, দুর্বল ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি। আজ আমাদের দেশের কত লোক লোম্যান, টেগার্ট সাহেবের গোয়েন্দা-গিরি করিতেছি। কয়েকদিন পর লোম্যান সাহেব আবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন আমার ভিতর দুর্বলতা আসিতেছে কি না। হাইকোর্টে আমাদের আপীল চলিবে—তাই তিনি বলিলেন, "আশু মুখার্জীকে তোমরা পাইবে না,—সে রাজনৈতিক মামলার আসামীদিগকে ছাড়িয়া দেয়, ন্যায় বিচার করে না। ইহার কয়েকদিন পর আমাদের ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে এই সংবাদ দিলাম। তিনি

আদালতে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর আবার লোম্যান সাহেব আমার নিকট আসিলেন। আমার তখন হাঁপানীর টান উঠিয়াছে, আমি কথা বলিতে পারি না। তিনি আমাকে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বি, সি চ্যাটার্জীকে কি বলিয়াছিলাম। আরও বলিলেন, "তোমার উপর এতটা রাগ হইয়াছিল যে তখন তোমাকে পাইলে আমি গুলি করিতাম।"

একদিন জেলের আই, জি, আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার হাঁপানী হইয়াছে কিন্তু আমাকে হাঁসপাতালে লইয়া যায় না, আমাকে দিয়া এখনও কাজ করায়। আমি কোন ঔষধ পাই না, এমন কি সাবু-বার্লি পর্যন্ত চাহিয়া পাই না। তিনি আমার টিকিট হাতে লইয়া "So many names like Puran Chore" অর্থাৎ পুরান চোরের মত এতগুলি নাম, বলিয়া টিকেটটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে আমাদের আপীল হইয়া গিয়াছে। দাশ মহাশয়ও আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আপীলে প্রতুলবাবু ও রমেশ চৌধুরী খালাস পাইলেন, আমার পাঁচ বৎসর কমিয়া দশ বৎসর সাজা হইল। খগেনবাবু ও মদনবাবুর দশ বৎসর দণ্ডাজ্ঞা বহাল রহিল। প্রতুলবাবু ও রমেশবাবু খালাস পাইলেন বটে কিন্তু জেল হইতে মুক্তি পাইলেন না। জেলেই আটক রহিলেন। সেই যুগে প্রত্যেক কয়েদীর গলায় লোহার হাঁসুলী পরাইয়া দিত এবং তাহার মধ্যে একখণ্ড ত্রিকোনাকার কাঠ ঝুলিয়া থাকিত। সেই কাঠে কয়েদীর নম্বর, ধারা, কত বৎসর সাজা ও খালাসের তারিখ ইত্যাদি থাকিত। হাঁসুলী গলার মধ্যে এরূপভাবে আটকাইয়া দিত যে তাহা খোলা যাইত না এবং রাত্রে শুইতে খুব অসুবিধা হইত। সেই যুগে খাবার পাত্র ছিল লোহার থালা ও বাটি।

আমরা জেলে; কিন্তু বাহিরে অনেক কাণ্ড ঘটিয়াছে। পাঞ্জাবে বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হইয়াছে। বহুলোক ধরা পড়িয়াছে, অনেকের ফাঁসীও হইয়াছে। রাসবিহারী বাবু ধৃত হন নাই। তিনি যখন দেখিলেন, আর কোন আশা নাই, ভারতে

থাকা নিরাপদ নহে, তখন স্থির করিলেন বিদেশে যাইবেন, যদি বিদেশ হইতে কিছু করিতে পারেন। রাসবিহারীবাবু জাপানে গেলেন। রাসবিহারী বোস, কর্তার সিং, ৺জোয়ালা সিং প্রভৃতি বিপ্লবীরা উত্তর ভারতে লাহোর হইতে বেনারস পর্যন্ত বহু 'কানটন্‌মেণ্টের' সৈন্যদের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা একযোগে একই দিন ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবেন। কিন্তু নানা কারণে ঘোষণার দিন ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে লাগিল ও পরে সরকারের নিকট এই সংবাদ পৌছিল। সরকার তখনই সাবধান হইলেন এবং ধরপাকড় সুরু হইল। বাংলাদেশে সরকার তখন ১২শত লোককে বিনাবিচারে আটক করিলেন। বহুলোক বিভিন্ন মামলায় দণ্ডিত হইল। গভর্ণমেণ্ট সর্বত্র দেশে দমননীতি চালাইলেন। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়াও বিপ্লব আন্দোলনের গতি তীব্রবেগেই চলিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আন্দামানে

আমাদের এখন আন্দামান যাইবার পালা। সেখানেই এখন নরক-গুলজার করিতে হইবে। সাধারণতঃ রোগীদিগকে আন্দামানে পাঠান হয় না। এজন্য সন্দেহ ছিল, আমাকে পাঠান হইবে কি না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সে সন্দেহ ভাঙিয়া গেল। আন্দামান যাত্রীদিগকে পূর্বে 'মেডিকেল বোর্ড' স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। আমি হাঁপানীর রোগী ছিলাম, বোর্ড আমাকে পরীক্ষা করিলেন। একজন বলিলেন ইহার হাঁপানী আছে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, 'This man must go' পরে দেখিলাম, আমার টিকিটে লেখা আছে, "Has asthma. Vide I. I. Prisons Letter. Fit for travel, আর কোন সন্দেহ রহিল না। এই জেলে আমরা প্রায় নয় মাস কাটাইয়াছি। এখন আন্দামানে যাইতে হইবে। আন্দামান হইতে ফিরিব কি না তার কোন ভরসা নাই, না ফিরিবার সম্ভাবনাই বেশী। নির্জন সেলে বসিয়া কত কথাই না মনে হইতেছে কিন্তু প্রাণের কথা তো কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। হয়ত চিরকালের জন্য বিদায় হইয়া যাইতেছি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কাহারও সহিত দেখা হইল না, কাহাকেও দুইটা কথা বলিয়া যাইতে পারিলাম না, কাহারও নিকট হইতে বিদায় লইবারও সুযোগ পাইলাম না। যাইবার পূর্বে সেলের দেওয়ালে সুরকী দিয়া লিখিলাম।

"বিদায় দে'মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে,
এই প্রার্থনা করি মাগো মনে যেন রেখো সন্তানে।
আবার আসিব ভারত-জননী মাতিব সেবায়,
তোমার বন্ধন মোচনে মাগো যেন এ প্রাণ যায়।

বিদায় ভারতবাসী বিদায় বন্ধু বান্ধবগণ,
বিদায় পুষ্পতরুলতা বিদায় পশু পাখীগণ।
ক্ষমো সবে যত করেছি অপরাধ জ্ঞানে অজ্ঞানে,
বিদায় দে'মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে।"

আমরা জেল হইতে রওয়ানা হইলাম। আমাদের হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি পূর্ব হইতেই ছিল। এখন কোমরে দড়ি বাঁধা হইল এবং আমরা জেল অফিসের সম্মুখে আসিয়া জোড়া জোড়া হইয়া বসিলাম। জেলার সাহেব পরিদর্শন করিতে আসিলেন। আমাকে বলিলেন, 'তুমি সেখানেই মরিবে।' ইহা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল কিন্তু এই বাণী সফল হয় নাই। ইহার পর আমরা বন্দুকধারী প্রহরী বেষ্টিত হইয়া জাহাজে চড়িলাম। ইহা ছিল আমাদের প্রথম সমুদ্র যাত্রা। যাত্রার সময় আমাদের মনে যে কষ্ট হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, যতদূর মনে পড়ে আমরা বেশ হাসিখুশীই ছিলাম। তিন দিন তিন রাত্রি জাহাজে ছিলাম, চতুর্থ দিন বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছিলাম। পথে আমাদের খাইবার ব্যবস্থা ছিল চিঁড়া আর গুড়। কিন্তু এই কয়দিন কেহই খাইতে পারে নাই—জাহাজ এরূপ দুলিতেছিল যে কেহই বিছানা হইতে মাথা উঠাইতে পারে নাই। উঠালেই বমি হইত। সকালে ও বিকালে হাওয়া খাওয়াইবার জন্য আমাদিগকে জাহাজের উপর লইয়া যাওয়া হইত। ঢেউএর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ যখন উপরে উঠিত তখন মনে হইত উহা আকাশ স্পর্শ করিবে আবার যখন নীচের দিকে নামিত তখন মনে হইত এইবার উহা পাতালপুরী চলিল। ১৯১৬ সনের মাঝামাঝি আমরা আন্দামান পৌঁছিলাম। সাধারণ কয়েদী সহ আমরা ৯৬ জন ছিলাম। তাহার মধ্যে দশজন ছিল মেয়ে কয়েদী—তাহাদের সঙ্গে ২।৩টি শিশুও ছিল।

স্থান হিসাবে আন্দামান অস্বাস্থ্যকর হইলেও ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। সমুদ্রের মধ্যে পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর সেলুলার জেল। জেলের তেতালা হইতে সমুদ্র ও পাহাড়ের দৃশ্য মনোরম দেখা যাইত। সেলুলার জেলে ৭০০ শত কয়েদী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ৭০০ শত সেল আছে। আন্দামানে

ছোট বড় প্রায় ২০০ শত দ্বীপ আছে। সাধারণ কয়েদীদিগকে সেলুলার জেলে তিনমাস হইতে দুই বৎসর রাখা হয়, পরে বিভিন্ন দ্বীপ বা টাপুতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; সেখানেও তাহাদিগকে কয়েদীর মতই থাকিতে হয়, সরকারী কাজ করিতে হয় এবং সরকার হইতে তাহারা আহার্য্য পায়। তবে সেখানে তাহারা জেল হইতে কিছু বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা হইত না, তাহাদিগকে বরাবর জেলেই থাকিতে হইত। এই আন্দামান জেলের পত্তন রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যই হয়—আবার রাজনৈতিক বন্দীদের চেষ্টায়ই এই 'পেনাল সেটেলমেণ্ট' (Penal settlement) উঠিয়া যায়। ১৮৫৭ খৃ: অ: সিপাহী বিদ্রোহের পর এতলোক দণ্ডিত হইয়াছিল যে ভারতীয় জেলে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। তাই সরকার তাহাদিগকে আন্দামান পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। আন্দামান তখন আরো অস্বাস্থ্যকর ছিল। বর্তমানে আন্দামানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সহর দেখা যায়। এই সহরগুলি সেই রাজনৈতিক কয়েদীদের মৃত স্তূপ হইতে সৃষ্ট। হতভাগ্য কয়েদীরা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ম্যালেরিয়া, ডিসেন্ট্রির সহিত লড়াই করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলির পত্তন করে। তখন আন্দামানের অবস্থা এরূপ ছিল যে কেহ আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিত না—কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তাহাদের জীবন-দীপ নিভিয়া যাইত।

সেলুলার জেলে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পায়ের বেড়ী কাটিয়া দিল। মনে হইল পা খুব হালকা হইয়া গিয়াছে—চলিতে ভয় ভয় লাগে। কিছুক্ষণ পর খুব তল্লাসী সুরু হইল—কেহ যদি টাকা পয়সা সঙ্গে লইয়া আসে! আন্দামানে পৈতা রাখিবার হুকুম ছিল না, তল্লাসী করিয়া আমাদের গলা হইতে পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল। আমরা আপত্তি করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না। শুনিলাম উপেনবাবু প্রভৃতির পৈতা নাই। শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। ইহার পর বার্মা হইতে বার্মা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হইয়া কয়েকজন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত রামরক্ষা ছিলেন। রামরক্ষা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, তাঁহার পৈতা লইয়া যাওয়ায় তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ

করেন। তিনমাস অনশনের পর তাঁহার মৃত্যু হয় কিন্তু তথাপি তাঁহাকে পৈতা দেওয়া হয় না। আন্দামানে আমরা প্রায় ১০০ শত রাজনৈতিক কয়েদী ছিলাম।

আন্দামানে জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সর্বেসর্বা। সেখানে কোন জেল পরিদর্শক যাইতেন না—চীপ কমিশনার বৎসরে তিন চারিদিন পরিদর্শন করিতে যাইতেন। চীফ কমিশনারের নিকট কয়েদীদের অভিযোগ করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু আগে পিছে বন্দুকধারী সিপাহীসহ এরূপ জাঁকজমকের সহিত তিনি আসিতেন যে, সাধারণ কয়েদীরা কিছু বলিতে সাহস করিত না। আর বলিলেও বিশেষ কিছু লাভ হইত না। কারণ তিনি কয়েদীদের কথা কখনও বিশ্বাস করিতেন না, জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথাই বিশ্বাস করিতেন। আন্দামানে প্রত্যেক কয়েদী বৎসরে একখানা চিঠি বাড়ীতে লিখিতে পারিত ও একখানা চিঠি বাড়ী হইতে পাইতে পারিত। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কোন অপরাধের জন্য তাহার সাজা হইত তবে সে সেই অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইত। আন্দামানের জেলের খাওয়া দেশের জেল হইতে অনেক খারাপ। সস্তা রেঙ্গুন আতপ চাউলের ভাত, সারা বৎসরে দুইবেলা অড়হর ডাল এবং অখাদ্য ঘাস পাতার তরকারী—ইহাই ছিল নিত্যকার খাদ্য। রাত্রে জেলে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না, পায়খানার ব্যবস্থাও ছিল অদ্ভুত। রাত্রে প্রত্যেকের সেলে একটি করিয়া মাটির ঘট দেওয়া হইত; এক সেরের বেশী তাহাতে জল ধরিত না। রাত্রে কাহারও পায়খানার বেগ পাইলে প্রথমতঃ তাহাকে অন্ধকারে পাদিয়া ঘটটীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার মুখ ঠিক করিয়া পর পর মলও মূত্র ত্যাগ করিতে হইত। মল ও মূত্র দুইটী একসঙ্গে ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। তাই মূত্রের বেগ বন্ধ করিয়া ঘটের মধ্যে মলত্যাগ করিতে হইবে, মলত্যাগ বন্ধ করিয়া পুনরায় ঘটের মুখ ঠিক করিয়া মূত্রত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ একটি বন্ধ করিয়া অপরটী ত্যাগ করিতে হইবে। একসঙ্গে দুইটি ত্যাগ করিলে একটি মাটিতে পড়িবে এবং তাহাতে নিজের কোঠাই নষ্ট হইবে। কারণ ২।৩ মাস পর একদিন মলমূত্র ত্যাগের স্থানে চুন লাগাইবে, আর মলমূত্র মাটিতে পড়িলে মেথর যদি তাহা রিপোর্ট করে তবে বন্দীর সাজা হইবে। জল খরচও সাবধানে

করিতে হইবে, বেশী জল খরচ করিলে তাহা গড়াইয়া নিজের বিছানা ভিজাইবে। কিছুদিন পর আমাদের এইসব অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, বারীনবাবু প্রভৃতি সকলেই একাজে সুদক্ষ ছিলেন। ঘটের মুখ ৩।৪ ইঞ্চির বেশী চওড়া হইবে না। আন্দামানে কয়েদীদের আহারের পরিমাণ যেমন ছিল কম তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার হইত তেমনি বেশী। বছরে দুই একদিন মাছের ঝোল বা মাছসিদ্ধ পাওয়া যাইত।

আন্দামানে প্রত্যেক কয়েদীর "জেল হিষ্টরী" টিকেটে তাহার পূর্ব্বের "হিষ্টরী" লেখা থাকিত। আমার টিকেটে লেখা ছিল : Previous History The accused was one of a gang of Bengali students concerned in a conspiracy ; a conspiracy to wage war against the King Emperor and whose operations extended from the year 1908 to December 1914. He was a member of Anushilan Samity, a society whose object was to overthrow the British rule in India and whose members committed several dacoities to procure money for the purchase of arms and ammunitions and the carrying out of the business of the society. He was one of the earliest members, took training from the arch anarchist P. Das. He absconded while the Dacca Conspiracy Case was started. He was one of the leaders of the Revolutionary Party—was suspected in 14 murders and dacoities. Very dangerocs.

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাদের স্বাস্থ্য পরিক্ষা করিয়া কঠিন কাজের ব্যবস্থা করিলেন। আমি বলিলাম আমার হাঁপানি আছে। তিনি ধমক দিয়া বলিলেন—ইহা আন্দামান। শচীনকে ঘানিতে এবং আমাদিগকে নারিকেলের ছোবড়া পিটাইয়া তার বাহির করিতে দিল। ইহা কঠিন কাজের মধ্যে গণ্য। আমাকে হাসপাতালে রাখিত না—তাই অসুখ লইয়াই কাজ করিতে হইত।

অসুখের জন্য যে যাহা খাইতে বলিত খাইতাম। একজন বলিল, কেরোসিন তেল খাইলে হাঁপানি ভাল হয়, একদিন সংগ্রহ করিয়া কিছু কেরোসিন তেলই খাইলাম। কোন উপকার পাইলাম না—অধিকন্তু পায়খানার সহিত কেরোসিন বাহির হইল—এমনকি বায়ুনিঃসণের সহিত কেরোসিন বাহির হইতে লাগিল। একজন বলিল হাঁপানীর টান উঠিলে মুখে তামাক পাতা রাখিলে আরাম বোধ হইবে। তাহাই করিলাম, কিন্তু আমার ইহাতে মাথা ঘুরাইতে ও বমি হইতে লাগিল। বন্ধুরা তখন জল দিয়া মাথা ধুইয়া দেয়। একদিন হাঁপানীর টান এতটা বৃদ্ধি পায় যে আমাকে ধরাধরি করিয়া হাঁসপাতালে রাখিয়া আসে এবং পরদিন ডাক্তার হাঁসপাতালে ভর্তি করিতে বাধ্য হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেদিন হাঁসপাতালে যান নাই। পরদিন আমাকে হাঁসপাতালে দেখিয়া ডাক্তারকে ধমক দিয়া—তিনি নিজেই আমাকে হাঁসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দিলেন।—আরো বলিলেন।—"দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিলে, তাহা মনে নাই, এখন এখানে দুধ খাইতে আসিয়াছ?" আন্দামানে সাতটা ইয়ার্ড আছে, ইহাদের এক ইয়ার্ড হইতে অন্য ইয়ার্ডে যাইবার হুকুম নাই। রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে এই সাত ইয়ার্ডে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছিল, কোন ইয়ার্ডে ৮।১০ জন আবার কোন ইয়ার্ডে ১৫।১৬ জন থাকিত। প্রেসিডেন্সি জেলে আমরা পাশাপাশি শেলে থাকিতাম, সেখানে না হয় কথা বলিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু এখানে আমরা এক ইয়ার্ডে থাকি—দিনের বেলায় একত্র থাকি, এক বারান্দায় কাজ করি তথাপি পরস্পর কথা বলিতে পারিব না, পাশাপাশি বসিয়া খাইতে পারিব না, পাশাপাশি পায়খানায় বসিতে পারিব না—প্রত্যেকটি সময় আমাদের পরস্পরের মধ্যে কয়েকজন সাধারণ কয়েদী বসিবে।

আন্দামানের সরকারী বিবরণ হইতে জানা যাইবে, যে, সেলুলার জেলে গড়ে প্রতিমাসে তিনটি করিয়া লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। মানুষ সহজে আত্মহত্যা করিতে চায় না, কিন্তু সেখানে কয়েদীদের প্রতি এতটা নির্যাতন করা হইত, যে, তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারিত না, আত্মহত্যা করিয়া সকল

নির্যাতনের হাত হইতে মুক্ত হইত। সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা ইহার প্রতিকার করিতে বদ্ধ পরিকর হইল। এই উপলক্ষে আমরা 'নরম ও গরম' দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলাম। সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় ও বারীনবাবুরা পূর্ব্বে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া কিছু সুবিধাও আদায় করিয়াছেন। এখন তাঁহারা জেলার ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে খুব প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা এখন ঐসব সুবিধা ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত নন। পুলিনবাবু কোন গণ্ডগোলে যাইতেন না—কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হইবারও চেষ্টা করিতেন না। স্নেহপরবশ হইয়া তিনি আমাদিগকে বলিতেন, জেলে গণ্ডগোল করিয়া সাজা বাড়াইয়া লাভ কি? বরং শান্ত ভাবে থাকিয়া বাহিরে যাইতে পারিলে, আরো দেশের সেবা করিতে পারিবে। তখনও আমার হাঁপানী সারে নাই, এজন্য বন্ধুরা আমাকে গণ্ডগোল করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তখন সারারাত্র কাশিতাম, সময় সময় প্রহরীরা বলাবলি করিত, আজ রাত্রে এই বাঙ্গালী মারা যাইবে। শেষরাত্রে যখন একটু তন্দ্রার ভাব আসিত তখন প্রহরীরা আমাকে জাগাইয়া দেখিত আমি বাঁচিয়া আছি কিনা। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট, রাত্রে কফ ফেলার জন্য একটি পাত্র চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পাইলাম না। জেলার সাহেব বলিলেন, প্রস্রাবের পাত্রে কফ ফেলিও। আমি দেওয়ালের গায়েই কফ ফেলিতাম। আমার শরীর এত দুর্বল ছিল যে দুইহাত দূরে যাইয়া প্রস্রাব করিতে কষ্ট বোধ হইত। আমার ধারণা হইল প্রেসিডেন্সী জেলের জেলারের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হইবে, আমি আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। সময় সময় নির্জন অন্ধকারময় সেলে বহুপূর্বস্মৃতি জাগিত। মনে হইত যে-পা একসময় আমাকে ৮৫ মাইল রাস্তা অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, ১০৫° ডিগ্রী জ্বরের মধ্যে ৩২ মাইল পাহাড়িয়া রাস্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, আজ সেই পা দুই হাত রাস্তা আমাকে বহন করিতে অক্ষম। এই অবস্থায় বাঁচিয়া থাকাও বিড়ম্বনা, সারাজীবন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।

সেলুলার জেলে বাঙ্গালী রাজনৈতিক কয়েদী ছিল ২৫।৩০ জন, মারাঠী ৩জন, ইউ, পির অল্পকয়েকজন এবং বাকি সব ছিল পাঞ্জাবের এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল শিখ। ইহার পর 'মার্শাল-ল' কেসে গুজরাট ও আমেদাবাদ হইতেও কিছুলোক আসিয়াছিল। জেলে বিশেষ শ্রেণীর কোন কয়েদী ছিল না, সকলেই সাধারণ শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য ছিল। ব্যারিষ্টার বিনায়ক দামোদর সাভারকর, প্রফেসার ভাই পরমানন্দ, বারীন ঘোষ, ভাই বুড্ডাসিং (যার Previous Historyতে লেখা ছিল, তিনি ব্যাঙ্কক এর একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী) সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই সাধারণ কয়েদী। কয়েদী কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিল জমাদার, তার অধীনে টিণ্ডেল তাহাদের অধীনে পেটি অফিসার ও সর্বনিম্নে ওয়ার্ডার ছিল। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য ৭ ইয়ার্ডে ৭ জন শ্বেতাঙ্গসৈনিক প্রহরী ছিল। আন্দামানে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের কয়েদী ছিল, সেখানে সাধারণ ভাষা ছিল হিন্দী। মেয়ে কয়েদীরা ভিন্ন জেলে থাকিত। তখন সেখানে পুরুষ কয়েদী ১০ বৎসর পর এবং মেয়েকয়েদী ৫ বৎসর পর বিবাহ করিয়া একত্র বাস করিতে পারিত। সেখানকার নৈতিক অবস্থা খুব শোচীয় ছিল, যুবক ও স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে প্রায়ই খুন হইত।

আন্দামানে আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার হিসাবে জেল আইন অমান্য করা স্থির হইয়া গেল। নরমপন্থীগণ তাহাতে যোগ দিলেন না। বন্ধুদের নিষেধ সত্বেও অসুস্থ শরীরে আমিও আইন অমান্যকারীদের দলই বাছিয়া লইলাম। সেলুলার জেলে আইন অমান্য সুরু হইল। আমরা স্বাধীন, কাহারও কোন হুকুম মানিনা, জেলের সাজারও আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা এখন পরস্পর কথা বলি, খাবার খারাপ ও কম বলিয়া হৈ চৈ করি, কোন কয়েদীকে কোন জেল কর্মচারী প্রহার করিলে আমরা দলবদ্ধভাবে বাধা দেই। এই সব অপরাধের জন্য আমাদের হাতকড়ি, বেড়ী, সেলবাস প্রভৃতি সাজা হয়। রাত্রে সকলেই সেলে থাকে, দিনের বেলায় সেলের বাহিরে, বারান্দায় বা কারখানায় কাজ করে। যাহাদের সাজা হিসাবে সেলবাস হয় তাহাদের দিনরাত্র

সেলেই থাকিতে হয়, শুধু স্নান খাবারের সময় অল্পক্ষণের জন্য সেল হইতে বাহির করে। সেখানে যেসব শিখ ছিল তাহাদের সকলেরই বয়স প্রায় ৪০এর উপর। ৫০।৬০ বৎসর বয়সেরও কয়েকজন ছিলেন। বাঙ্গালীদের প্রায় সকলেই ত্রিশ বৎসরের নীচে ছিলেন। সেলুলার জেলে শিখেরা খুব বীরত্ব দেখাইয়াছেন, বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। একদিন বৈকালে জেলার সাহেব আসিয়াছেন। সকলের কাজ হইয়া গিয়াছে। অমর সিং বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন এমন সময় জেলার সাহেব তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি বেড়াইতেছ কেন?" অমর সিং জবাব দিলেন "আমি কি তোমার বাবার মাথার উপর বেড়াইতেছি"? এই অপরাধের জন্য অমর সিংয়ের তিন মাস ডাণ্ডাবেড়ী ও সেল সাজা হয়।

একদিন পণ্ডিত পরমানন্দকে টিণ্ডেল জেলারের সম্মুখে হাজির করিয়াছে, অপরাধ সে কথা শুনে না বে-ফাইলে চলে। জেলার পরমানন্দকে 'মা-বাপ' তুলিয়া গালি দিলেন, পরমানন্দও তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাথি মারিয়া ও ঘুষি দিয়া ভূপাতিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জমাদার টিণ্ডেলদের লাঠিও তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। অবশেষে অজ্ঞানাবস্থায় পরমানন্দকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিচারে পরমানন্দের কুড়ি বেত হয়। এতদিন জেলারের উপর কেহ হাত উঠাইতে স্পর্ধা রাখে নাই। তাই এই ঘটনার পর জেলারের "প্রেসটিজ" (prestige) অনেকখানি কমিয়া গেল—সাধারণ কয়েদীরা খুব সন্তুষ্ট ও সহানুভূতিশীল হইয়া পড়িল। কিন্তু জেলারের ইঙ্গিতে জমাদার-টিণ্ডেলরাও গণ্ডগোলকারী রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে সময় সময় সুবিধামত প্রহার করিত। একদিন সর্দার ভানসিংকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে যে তাহার মৃত্যু অবধারিত ছিল। আমরা স্থির করিলাম ইহার প্রতিবাদে জেনারেল ষ্ট্রাইক করিতে হইবে—কেহ কোন কাজ করিব না এবং যে যে সক্ষম প্রায়োপবেশন করিব। প্রত্যেক ইয়ার্ডে গোপনে এই সংবাদ চলিয়া গেল। প্রায় ৭০ জন লোক ধর্মঘটে যোগ দিল। এই অপরাধের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ৬ মাস ডাণ্ডাবেড়ী, ৬ মাস সেল, সাত দিন খাড়া হাতকড়ি

ও কয়খানা সাজা হইল। এই সেল বাসের সময় আমি কুইনাইন খাইতে আরম্ভ করি। সুরেশ সেন মহাশয় মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে দিন আধসের করিয়া দুধ পাইতেন। তিনি ধর্মঘটে যোগ দেন নাই। প্রত্যহ তিনি তাঁহার দুধ আমার নিকট গোপনে পাঠাইয়া দিতেন, আমি তাহা পান করিতাম। এইরূপ একমাস দুধ পান করিবার পর আমার হাঁপানি সারিয়া গেল।

আমরা গোপনে সংবাদ পাইলাম চীফ কমিশনার আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিবেন। আমাদের বিশ্বাস ছিল চীফ কমিশনারের নিকট আবেদন করিলে কোন লাভ হইবে না। তবুও আমরা স্থির করিলাম, আমাদের মধ্যে কয়েকজন খুব শান্তভাবে ভানসিংয়ের প্রহারের কথাও জেলের সাধারণ অবস্থা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে। প্রত্যেক ইয়ার্ড হইতেই ২।১ জন লোক বলিবার জন্য ঠিক হইল, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। চীফ কমিশসার যখন আমার সেলের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন তখন আমি দাঁড়াইয়া সেখানকার প্রথা অনুসারে তাঁহাকে সেলাম করিলাম। তিনি আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমরা গণ্ডগোল করিতেছ কেন ?" আমি খুব শান্তভাবে বলিলাম "ভানসিংকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হইয়াছে।" তিনি উত্তর করিলেন, "ভানসিংকে প্রহার করা হয় নাই।" আমি বলিলাম, "ভানসিংয়ের এখনও মৃত্যু হয় নাই, সে এখনও মৃত্যুশয্যাশায়ী আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে একবার দেখিয়া আসিবেন।" তিনি বলিলেন, যদি তাহাকে মারিয়াই থাকে তাহাতে তোমার কি ?" He is nither your chacha nor your nana (সে তোমার চাচাও নয়, নানাও নয়)।" আমি বলিলাম, "সে আমার সহকর্মী, সে আমার বন্ধু।" তিনি বলিলেন, "তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে ?" আমি বলিলাম, "আমি অসুখে ভুগিতেছি, আমাকে হাঁসপাতালে রাখা হয় না। একদিন ডাক্তার আমাকে হাঁসপাতালে ভর্তি করিয়াছিলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে এজন্য ধমকাইয়া ছিলেন।" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন "ইহা মিথ্যা কথা। আমার বেশ মনে আছে সেদিন সে সম্পূর্ণ নীরোগ ছিল।" আমি টিকেট দেখাইয়া বলিলাম—"৩০শে তারিখে

আমাকে হাঁসপাতালে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ডাক্তার আমাকে 'ডিটেন' করিয়াছেন। ৩১শে তারিখে আমার অবস্থা আরও খারাপ ছিল। এইজন্যই ডাক্তার আমাকে ভর্তি করিয়াছিলেন। আপনি কি এখন বিশ্বাস করিতে পারেন যে একদিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া গেলাম ? চীফ কমিশনার তখন "this is your 'bahana'" (এ তোমার বাহানা) বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন একজন শিখ সেলের দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে। জেলার তাহাকে দাঁড়াইতে আদেশ দিল কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিল না। আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখেন যে অপর একজন শিখ শুইয়া আছে। তিনি তাহাকে ডাকিলে সে তাঁহার 'মা-বাপ' 'চৌদ্দ গোষ্ঠী' উদ্ধার করিয়া বলিল, "আমার ঘুমের ব্যাঘাত করিও না—এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি তো তোমাকে ডাকি নাই তবে কেন আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ ?" প্রত্যেক ইয়ার্ডেই এইরূপ ব্যাপার হইল।

আমাদিগকে যখন খাইবার সময় ও স্নানের জন্য সেল হইতে বাহির করিত তখন জেলের অপর সকল কয়েদীদিগকে ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিত, যাহাতে কাহারও সহিত আমাদের দেখা না হয়। পাঞ্জাবী শিখেরা ছিলেন খুব বলিষ্ঠ, কাহারো ওজন ২০০ পাউণ্ড কাহারও বা ২৫০ পাউণ্ড। একজনে একটা আস্ত পাঁঠা খাইতে পারেন। জেলের সাধারণ খাওয়াতেই তাহাদের পেট ভরিত না। তাহার উপর এখন যে কম খাওয়া পাই তাহাতে আমারই পেট ভরে না, তাহাদের কি করিয়া পেট ভরিবে ? খাইবার পরে কেহ কেহ বলিতেন, না খাওয়াই ভালো—খাইলে আরো ক্ষুধা বাড়ে। ইহার পর এক এক জনের ৪০।৫০ পাউণ্ড ওজন কমিয়া গিয়াছিল। আমরা ভাই জোয়ালাসিংকে 'ভাই ভোল' ও শেরসিংকে 'ভাই হাতি' বলিয়া ডাকিতাম। একদিন হাঁসপাতালে শেরসিংকে এক বালতি দুধ দেখাইয়া ডাক্তার বলিয়াছিলেন সে তাহা খাইতে পারে কিনা। বালতিতে দশসেরের দুধ ছিল, শেরসিং তৎক্ষণাৎ বালতিতে চুমুক দিয়া তাহা শেষ করিয়া দিয়া ছিল। ডাক্তার তখন অপ্রস্তুত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সন্তুষ্টও হইয়াছিলেন। এই শেরসিংই একদিন একসের সরিষার তেল খাইয়া হজম করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি এই—ফণীবাবু আমার নিকট এক সময় দুই পাতা তামাক পাঠাইয়া এক সের তেল সংগ্রহ করিয়া দিতে সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন। আমি তদনুসারে ঘানি ঘরের একটা লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তেল আনিবার সময় আমি মালসহ ধরা পড়িয়া গেলাম। টিণ্ডেল আমাকে মালসহ হাজির করিবে এমন সময় শেরসিং আসিয়া টিণ্ডেলকে 'সর্দ্দার' 'জনাব' প্রভৃতি সম্মান-সূচক সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি? টিণ্ডেল বলিল এই বাঙ্গালী তেল চুরি করিয়াছে। শেরসিং বলিল "তাই নাকি? নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছে। দেখি কতটুকু তেল?" এই বলিয়া তিনি টিণ্ডেলের হাত হইতে তেল দেখিবার জন্য বাটীটা লইয়া এক চুমুকে সবটুকু তেল খাইয়া ফেলিয়া, 'লে শালা' বলিয়া বাটীটা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। টিণ্ডেল দেখিল এখানে বলপ্রয়োগে সুবিধা হইবে না। মালও নাই, সাক্ষীও পাইবে না। সে রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল। কম খাবারে এই শেরসিং জাতীয় লোকের খুব কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেহ কোন দুর্বলতা দেখায় নাই। এই সময় একদিন বৈকালে আমরা খাইতে বসিয়াছি এমন সময় জেলার সাহেব পরিদর্শন করিতে আসিলেন। বৃদ্ধ নাধানসিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্যায়সা হ্যায় জী?" আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি নিশ্চয়ই বলিতাম "ভালো আছি" কিন্তু নাধান সিং উত্তর করিলেন—"কেন? তোমার মেয়েকে বিবাহ দিবে নাকি? তুমি যে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য বর খুঁজিতেছ? পায়ে বেড়ী, সারা দিনরাত সেলে বন্ধ, খাবার কম, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেমন আছি? ঠাট্টা করিতেছ? লজ্জা করেনা নির্লজ্জ বেহায়া? যা, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা।" জেলার সাহেব চলিয়া গেলেন। এইসব বুলি শুনিয়া জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। কতই বা সাজা দিবেন? সাজা দিলে যেন ইহাদের তেজ আরও বাড়ে।

শ্রীমদনমোহন ভৌমিক
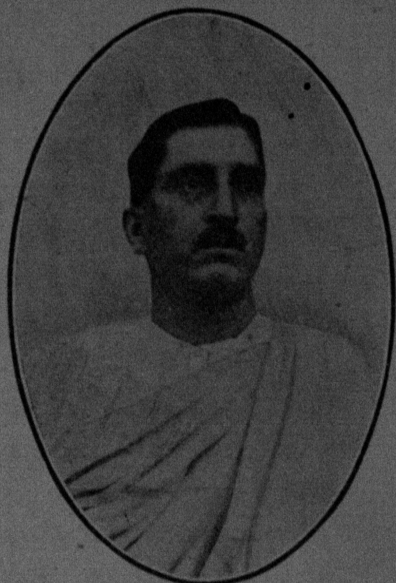
শ্রীঅমৃত হাজরা
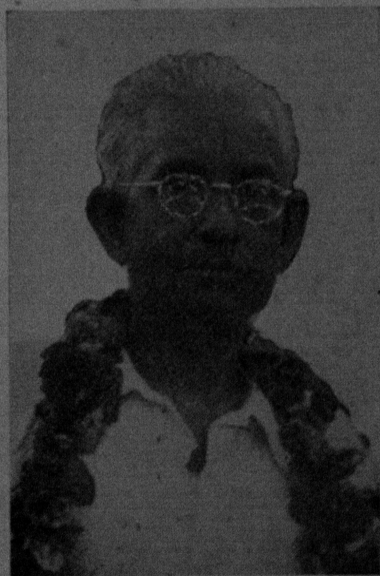
শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য্য

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

শ্রীকেদারেশ্বর সেন

শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ

সেলগুলি আট হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া ছিল, ইহারই মধ্যে আমাদিগকে সারা দিনরাত থাকিতে হইত। সেলে দিনের বেলায় বিছানা রাখিবার হুকুম ছিল না, সকালে বিছানা লইয়া যাইত। সেলে আমরা কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইতাম। কিন্তু কেহই কবি ছিলাম না। কবি হইবার সাধও ছিল না, কবিতা লিখিতেও জানিতাম না। কবিতার ছন্দ ব্যাপারে বাধ্য হইয়াই আমরা ছিলাম বিপ্লবী, কবিতা লিখিবার সাধারণ নিয়ম কানুন মানিয়া চলিতাম না। যাহা খুসী এবং যেভাবে ইচ্ছা আমরা কবিতা রচনা করিতাম। আমরা জানিতাম আমাদের কবিতা কখনও পুস্তকাকারে বাহির হইবে না, বাহির হইলেও কেহ পয়সা দিয়া তাহা কিনিয়া পড়িবে না। কাজেই কবিতা লিখিয়া আমাদের মার খাইবার কোনই ভয় ছিল না। ট্রাইকারদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল পাঞ্জাবী। তাহারা বাঙ্গালা জানিতেন না। তাই আমি স্থির করিলাম ইংরাজীতে কবিতা লিখিব। কবিতা লিখিবার জন্য আমাদের কাগজ কলম ছিল না, কাগজ কলমের প্রয়োজনও হইত না। আমাদের সম্বল ছিল সেলের মেঝে, দেওয়াল ও সুরকী। প্রথম কবিতা লিখিলাম :—

What have I, how shall I worship thee,
I know not, Oh God, please tell me ;
I am prisoner, have no flower,
My heart is desert, there's no water ;
I am wandering always in the dark,
Unable to follow the Sage's footmark ;
I heard that you are with the name,
So I always sing your fame.

দ্বিতীয় কবিতা লিখিলাম :

Murray the Superintendent is a first-class scoundrel,
Unwilling to keep the sickmen in the hospital ;
For nothing, he abuses, punishes the prisoner
What shall I say of his brutal behaviour.

* * * *

এইরূপ বেপরোয়া ভাবে আমরা কবিতা লিখিতে লাগিলাম এবং খাইবার সময় পরস্পরের কবিতা শুনিতাম।

ইতিমধ্যে ভানসিংহের মৃত্যু হইয়াছে, আরো ২।১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আন্দামান হইতে গোপনে দেশে কোন খবর পাঠানো কঠিন ছিল। সেখানে সাধারণ কোন পোষ্টাফিস ছিল না, সরকারের হাত দিয়া সমস্ত চিঠি যাইত। এক "মহারাজ" ব্যতীত অপর কোন জাহাজ আন্দামানে যাইতে পারিত না। এরূপ অবস্থার মধ্যেও আমাদের ষ্ট্রাইকের, ভানসিং ও রামরক্ষার মৃত্যুর এবং সেলুলার জেলের দুরবস্থার কথা 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং সুরেন্দ্রনাথ কাউন্সিলে এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। সরকার বাহাদুর জানাইলেন,—কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক গণ্ডগোল করিতেছে। এই ধর্মঘটে কোন নেতা যোগ দেন নাই এবং ইহাতে তাহাদের কোন সহানুভূতিও নাই।—ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিল। সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় গোপনে আমাদিগকে উৎসাহ দিতেন—কিন্তু আমরা যখন প্রকাশ্য ভাবে আমাদের সহিত যোগ দিতে বলিলাম, তখন তাঁহারা যোগ দিলেন না। কিন্তু ধর্মঘট চলিতে লাগিল। অবশেষে ছয় মাস অতীত হইবার পর আমাদের বেড়ী কাটিয়া দিল। কেহ কেহ বেড়ী কাটিতে দিবেন না বলিয়া আপত্তি জানাইলেন—তথাপি কর্তৃপক্ষ জোর করিয়া তাহাদের বেড়ী কাটিয়া দিলেন।

আমরা সেল হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম চলিতে লাগিল—আমরা পুনঃ পুনঃ দণ্ডভোগ করিতে লাগিলাম। একদিন ছত্তার সিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রহার করিলেন। ফলে ছত্তার সিংও যমের দক্ষিণ দ্বার দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রতি অনির্দিষ্ট কালের জন্য হাতকড়ি, বেড়ী ও সেল-সাজা হইল। পাঁচ বৎসর পুরা তিনি এই অবস্থায় থাকেন ও পরে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিছুদিন পর আমি বাড়ী হইতে চিঠি পাইলাম। আমার মেজদা লিখিয়াছেন, আমি এখানে আমার দুষ্কর্মের ফলভোগ করিতেছি। আমি যেন সদ্ভাবে থাকি, তিনি আমার জন্য অত্যন্ত

চিন্তিত ও দুঃখিত আছেন। এতদিন আমি বাড়ীতে কোন চিঠি লিখি নাই—বুঝিলাম, সরকার পক্ষ হইতে দাদাকে দিয়া এরূপ চিঠি লেখানো হইয়াছে।

বেপরোয়াভাবে কবিতা লিখিবার মত সব কাজেই আমরা বেপরোয়া ছিলাম। আমাদের সাজার ভয় নাই, প্রাণের মায়া নাই। তাই জেল কর্মচারীরা এখন আমাদিগকে ভয়ের চক্ষে দেখিত। সাধারণ কয়েদীরাও আমাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। জেলের এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, মারপিট কমিয়া গেল—এখন আর আত্মহত্যা হয় না। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ও আমেদাবাদ হইতে 'মার্শাল-ল কেসের' কিছু লোক আসিয়া হাজির হইল। আসিতেই তাহাদিগকে ঘানিতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাহারা সত্যাগ্রহ শিখিয়া আসিয়াছে, এখানেও তাহারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিল। তাহারা ঘানি টানিবে না—ঘানিঘরে তাহারা শুইয়া পড়িল। জেলারের হুকুমে তাহাদের হাত পা বাঁধিয়া ঘানির সহিত জুড়িয়া অপর লোককে ঘানি ঘুরাইতে বলিল। এরূপভাবে তাহাদিগকে ঘানির চারিদিকে হেঁচড়াইতে লাগিল যে তাহাদের, পিঠ ও হাত পায়ের চামড়া উঠিয়া গেল। শীঘ্রই এই সংবাদ আমাদের কাণে গিয়া পৌঁছিল। আমি, ভূপেনবাবু, নাধান সিং প্রভৃতি কয়েকজন হৈ চৈ করিতে লাগিলাম, জেল কর্তৃপক্ষ গণ্ডগোলের আশঙ্কা দেখিয়া অগত্যা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। গণ্ডগোলকারীদিগকে সেলে আবদ্ধ করা হইল। আমার পূর্ব্বের একটা অপরাধের জন্য তিন মাস ডাণ্ডাবেড়ী ও সেল সাজা চলিতেছিল। আমি জানিতাম, যে, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহিত পরদিন বচসা হইবে। সেইজন্য ঠিক করিয়াছিলাম হিন্দীতে কথা বলিব। কারণ ইংরাজীতে কথা বলিলে অপরে বুঝিবে না, আমি তাহাকে গালি দিলাম কি প্রশংসা করিলাম। পরদিন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসিলে আমি সেলাম দিলাম। তিনি আমার সেলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি পূর্ব্বদিনের ঘটনা সম্পর্কে বলিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন 'জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তুমি না আমি?' আমি বলিলাম 'জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আপনি এই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—মার্শাল-ল' বন্দীদের উপর এরূপ অত্যাচার করা হইল কেন?'

তিনি তখন আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ রও শুয়ার কা বাচ্চা।" আমিও তখন দ্বিগুণ আওয়াজে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ধমক দিয়া বলিলাম—"তুম চুপ রও কুত্তিকা বাচ্চা"। ইহার পর আমার মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী ও পাঞ্জাবী গালী বাহির হইতে লাগিল। ইহাতে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সম্পর্কিত কেহই বাদ গেল না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। পরে জানিতে পারিলাম, এই অপরাধের জন্য চারদিন 'পেনাল ডায়েট' (penal diet) সাজা দিয়াছেন। অর্থাৎ দুইবেলা মাত্র এক পাউণ্ড (আধসের) করিয়া ভাতের ফেন খাইতে পারিব, অন্য কোন খাবার পাইব না। আমি যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে গালী দিয়াছি, এই সংবাদ, অল্পক্ষণের মধ্যেই জেলের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। খাবার সময় পাচক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি খাইতে চাই, ভাত না রুটী ? আমি বলিলাম, 'আমার সাজা হইয়াছে, আমাকে ফেন দাও।' সে বলিল, 'তোমার বাহাদুরির কথা আমরা শুনিয়াছি, চৌকায় আমরা ঠিক করিয়াছি, তোমাকে ফেন খাইতে দিব না। তুমি যাহা খাইতে চাও তাহাই দিব।—আমি ইতঃস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় খাবারের সঙ্গে যে 'পেট্টী অফিসার' আসিয়াছিল সে ফেন মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "বাঙ্গালী শের হ্যায়, ডবল খানা দাও।" ইহার পর, আমার সেলে অনেকে গোপনে চাটনী ও রুটী পাঠাইতে লাগিল। এত খাবার আসিতে লাগিল যে আমি তাহা বিতরণ করিতে লাগিলাম। আমার চারদিন এইভাবেই কাটিয়া গেল, ফেন একদিনও খাইতে পাইলাম না।

আন্দামানে যাঁহারা গণ্ডগোল করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। বেত ছাড়া, জেলের সমস্ত রকম সাজা আমার হইয়াছে। ক্রস-বার-ফেটার্স (cross bar fetters, সাধারণতঃ বেতের পরিবর্তে লাগান হয়), ডাণ্ডাবেড়ী, শিকলী বেড়ী, খাড়া হাত কড়ি, পিছনে হাতকড়ি, রাত্রে হাত কড়ি, পেনাল ডায়েট, সেল বাস প্রভৃতি সমস্ত সাজাই আমি ভোগ করিয়াছি। আন্দামানে আমাদের তিন বৎসরের উপর সংগ্রাম চলিয়াছে। বেড়ী পায়ে দিতে দিতে আমাদের পায়ে কড়া পড়িয়া

গিয়াছিল। এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলাম যে, বেড়ী পায়ে দিয়া আমরা দৌড়াইতে পারিতাম। মাঝে মাঝে কম্বলের কোর্তাকে ফুটবল বানাইয়াও বেড়ী পায়ে দিয়া খেলিয়াছি। আমরা সময় সময় ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু তর্ক করিয়াছি—ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে কিরূপ গভর্ণমেণ্ট হইবে, রাজধানী কোথায় থাকিবে। রাষ্ট্র ভাষা কি হইবে ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে হিংসা-অহিংসা, আমিষ ও নিরামিষ ভোজন লইয়াও তর্ক হইয়াছে। আমিষ ভোজন সম্পর্কে কেশর সিং বলিয়াছিলেন, মাছ মাংস আমরা কেন খাইব না? ইহাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হইতেছে যে তাহাদিগকে খাইলে দেশের অনিষ্ট হইবে? পাঁঠার যদি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সম্ভাবনা থাকিত অথবা যদি দেশ ভক্ত হইয়া ইহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারিত তবে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া উদর পূর্ণ করিলে অন্যায় হইত। সেরূপ সম্ভাবনা যখন নাই তখন কেন তাহাদিগকে খাইব না? আমাদের আহারের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

আমরা গোপনে সংবাদ পাইলাম জেল-কমিশন আসিতেছে এবং জেল কর্তৃপক্ষ চেষ্টায় আছেন যাহাতে আমাদের সহিত তাঁহাদের দেখা না হয়। আমাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা নিশ্চয় জেলে আসিবেন। তাই প্রত্যেক ইয়ার্ডে ই সংবাদ দেওয়া হইল তাঁহারা যে ইয়ার্ডেই যাইবেন সেই ইয়ার্ডেই চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিয়া কথা বলিতে হইবে। যথা সময়ে জেল-কমিশন জেলের মধ্যে আসিলেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত আলাপও হইল। তাঁহারা বলিলেন, অতীতে কি হইয়াছে আমরা সে বিচার করিতে আসি নাই। জেল সংশোধন কি ভাবে হইতে পারে তাহা লিখিয়া তোমরা আমাদিগকে জানাও। তোমাদের দরখাস্ত সাত খানার বেশী যেন না হয়, আর লেখা যেন এক রকম না হয়। আমাদের তরফ হইতে যে সাত খানা দরখাস্ত গেল তাহাতে ছিল:— পেনাল সেটেলমেণ্ট উঠাইয়া দিতে হইবে, দেশের জেলের মত তিনমাস অন্তর চিঠি লেখার অনুমতি দিতে হইবে, পৈতা ও ধর্মের চিহ্ন রাখিতে দিতে হইবে, ফাঁসী উঠাইয়া দিতে হইবে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে

ইত্যাদি। জেল কমিশন আমাদের দরখাস্ত পাইয়াই আদেশ দিলেন, তিনমাস অন্তর চিঠি লিখিতে পারিবে এবং পৈতা ও ধর্মের চিহ্ন রাখিতে পারিবে।

গভর্ণমেণ্ট যখন দেখিতে পাইলেন এখানে তিনবৎসরের উপর অনবরতঃ গণ্ডগোল চলিতেছে তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জেলারকে বদলী করিয়া দিলেন। নূতন জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া সুনাম অর্জনের জন্য আমাদের সহিত খুব সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। জেলেও শান্তি স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট "অ্যামনেষ্টি" (amnesty) ঘোষণা করিয়াছেন, আন্দামান হইতে বারীণবাবুর দল, শচীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন শিখ—মোট কুড়িজন মুক্ত হইলেন। জেলে প্রেস ছিল। পূর্বে বারীণবাবু প্রেসের ফোরম্যান ছিলেন। তিনি যাইবার পর এখন জগৎরাম প্রেসের ফোরম্যাম হইলেন। আমরাও প্রেসের কাজে আসিলাম। জেলখানায় অল্প বয়স্ক কয়েদীদের উপর খুব উৎপীড়ন হয়। তাই একদিন জেলার পণ্ডিত জগৎরামকে বলিলেন, 'বাচ্চা' ফাইলের লোক দিগকে প্রেসের কাজে দিব। তাহারা তোমাদের নিকট থাকিলে কেহ তাহাদের উপর জুলুম করিতে পারিবে না। 'বাচ্চা ফাইলে' ৭০টি তরুণ ছিল। তাহারা প্রেসের কাজে আসিল—আমি তাহাদের শিক্ষক হইলাম। প্রাতে ১০টা পর্য্যন্ত প্রেসের কাজ হইত এবং দ্বিপ্রহরে খাইবার পর লেখাপড়ার কাজ হইত। বাচ্চা ফাইলে ব্রহ্মদেশের এবং ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেরই তরুণ কয়েদী ছিল। কিছু দিন পর পেনাল সেটেলমেণ্ট উঠিয়া যায় এবং আমরা বাঙ্গালীরা সর্বপ্রথম আলীপুর জেলে চালান হই। ইহা ১৯২১ সালের শেষভাগে।

আন্দামানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণেশ দামোদর সাভার কর, শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর, (ব্যারিষ্টার) প্রঃ ভাই পরমানন্দ, সর্দ্দার জবালা সিং, পৃথ্বি সিং, গুরু মুখ সিং, ছত্তর সিং, নিধান সিং, কেশর সিং, বুড্ডা সিং, শের সিং, অমর সিং, বিশাখা সিং, রুর সিং, সোহন সিং, নন্দ সিং, ভান সিং, কেহের সিং, পণ্ডিত পরমানন্দ, পণ্ডিত জগৎরাম, পণ্ডিত রামসরণ

দাস, পণ্ডিত রাম রক্ষা, চৌধুরী বোগ্‌গামল, মহাশয় রতনচাঁদ, মোহম্মদ মোস্তাফা, আলী আহম্মদ, কাসেম, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল হাজরা, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ পাল, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যতীন নন্দী, শ্রীযুক্ত সতীরঞ্জন বোস, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত সানুকুল চ্যাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত স্বরেন কর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাউলাট বিল, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন

সরকার বাহাদুর যখন দেখিলেন বিপ্লবীরা এত কালের বিশ্বাসী সৈন্যদিগকেও হাত করিতে সক্ষম এবং জার্মাণীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তিন জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করাও তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে তখন তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিল। সরকার চিন্তা করিয়া দেখিলেন শুধু দমননীতি দ্বারা দেশ শাসন চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে শাসন ভারও দেশবাসীর হাতে দিতে হইবে। ইংলণ্ড চিরকালই রাজনীতিতে রক্ষণশীল এবং তাহার ফলে আমেরিকা হারাইয়াছে আয়ারলণ্ড হারাইয়াছে এবং ভারতবর্ষও হারাইতে বসিয়াছে। মর্লে-মিণ্টো রিফর্মের পরিবর্তে, ১৯০৯ সালে যদি "মণ্টেগু চেমস ফোর্ড রিফর্মস্" দিত, অথবা "মণ্টেগু চেমস ফোর্ড" রিফর্মের পরিবর্তে যদি তখন বর্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিত, তাহা হইলে দেশের লোক এতটা সন্তুষ্ট হইত যে তখন কোন প্রকার বিরুদ্ধ আন্দোলন করাই কঠিন হইত।

মহাযুদ্ধ শেষে সরকার দুইটি কমিশন বসাইলেন, একটি দমন নীতি প্রবর্তনের জন্য "রাউলাট কমিটি" ও অপরটি শাসন সংস্কারের জন্য, ইহাকে "মণ্টেগু চেমস ফোর্ড" কমিটি বলা যাইতে পারে। রাউলাট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন রাউলাট সাহেব, এজন্য ইহার নাম "রাউলাট" কমিটি—ও তাঁহারা যে আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা 'রাউলাট বিল' নামে খ্যাত হইয়াছে। এই কমিটির অপর নাম 'সিডিসন কমিটি।' এই কমিটির কাজ ছিল বিপ্লব আন্দোলন কতটা প্রসার লাভ করিয়াছে ও ইহার শক্তি কতটুকু ইত্যাদি অনুসন্ধান করা এবং কি ভাবে এই আন্দোলন দমন করা যাইতে পারে তাহা স্থির করা। "সিডিসন কমিটি রিপোর্টে" বিপ্লব আন্দোলনের কতকটা ইতিহাস আছে, ইহা অবশ্যই এক পক্ষের কথা। বিপ্লব আন্দোলনের প্রকৃত

ইতিহাস দেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে লেখা সম্ভবপর নয়। সিডিসন কমিটির পক্ষেও সকল কথা জানা সম্ভবপর হয় নাই। এই কমিটি বিপ্লব আন্দোলনের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য কতকগুলি নূতন আইনের খসড়া তৈয়ার করিলেন। সরকার তখন তাহা পাঞ্জাব প্রদেশে জারী করার ব্যবস্থা করিলেন। দেশে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু হইল। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের বড় বড় চিন্তাশীল নেতারা দেখিলেন যে এই বিল আইনে পরিণত হইলে দেশের জাতীয় আন্দোলন সমূলে বিনষ্ট হইবে। তাই তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন—এখন তিনি তাঁহার সত্যাগ্রহ অস্ত্র লইয়া ভারতের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোরে চলিতে লাগিল। পাঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশে "মার্শাল ল" জারী হইল, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটিল। অহিংস সত্যাগ্রহীরা বেশীদিন অহিংস থাকিতে পারিল না। পুলিশ ও সৈন্যেরা তাহাদের উপর লাঠি-চার্জ ও গুলি চালাইতে লাগিল। উত্তেজিত জনসাধারণ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া কয়েকটা সহর অধিকার করিয়া কোর্ট জ্বালাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন শেতাঙ্গ কর্মচারীকেও শেষ করিয়া দিল। কিছুদিনের মধ্যেই সরকার এই আন্দোলন দমন করিয়া দিলেন। চারিদিকে ধরপাকড় সুরু হইল। বহুলোকের জেল ও অনেকের ফাঁসীর আদেশ হইয়া গেল।

সরকার দমন নীতির প্রয়োগ দ্বারা বিপ্লব আন্দোলন দমন করিলেন সত্য কিন্তু দেশবাসীর মনের বিপ্লব দমন করিতে পারিলেন না। তাহাদের প্রাণে ক্রমশঃ আগুন জ্বলিতে লাগিল। শত শত যুবকের আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ ব্যর্থ হয় নাই। তাহাদের ধ্বংসস্তূপ হইতে নূতন ভারত সৃষ্টি হইল, দেশে নূতন জাগরণ আসিল, দেশবাসী প্রাণের অব্যক্ত ব্যথা এখন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে শিখিল। গভর্ণমেণ্টের দমন নীতি ব্যর্থ হইল,—'মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম' এর চাল ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন হইতে সুরু হইল নূতন আন্দোলন। ইহা পূর্ব দুই আন্দোলন হইতে বৃহৎ ও ব্যাপক,—ইহাই "নন-

কোঅপারেশন" বা অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু যুবকদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না,—ইহা দেশের জন সাধারণের আন্দোলন। গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে "রিফর্ম" দিলেন, সর্বসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিল। নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিলেন, সরকারের সহিত কোনরূপ সহযোগ করা হইবে না; আদালত বয়কট, স্কুল-কলেজ বয়কট ও নূতন শাসন সংস্কার বয়কট করিতে হইবে এবং নূতন কাউন্সিলে কেহ যাইতে পারিবেন না। তখন খিলাফৎ আন্দোলন চলিতেছিল। দলে দলে মুসলমানগণ এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। এই আন্দোলন ছিল ভারতব্যাপী এবং ইহাতে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক জেলে যায়। ইহার পূর্বে কখনও রাজনৈতিক অপরাধে এত অধিক লোক জেলে যায় নাই। গভর্ণমেণ্ট দমননীতি চালাইলেন, বড় বড় নেতা ও কর্মীরা জেল ভর্তি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিলেন ৩১শে মার্চের মধ্যে একবৎসরে স্বরাজ লাভ হইবে।

আন্দামান হইতে ১৯২১ সালের শেষভাগে আমরা আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর "হোম মেম্বার" স্যার হিউ. ষ্টিফেনসন, যিনি পরে গভর্ণর হইয়াছিলেন, আমাদের সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আন্দামানে খুব Trouble দিয়াছ, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের নিকট অনেক অভিযোগ আসিয়াছে, আশাকরি এখানে শান্তভাবে থাকিবে। আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম, আমরা সেখানে জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি মাত্র। আলীপুর জেলের জেলার ছিলেন বড় 'রায়ণ' সাহেব। আমরা তাঁহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম এবং কিছুদিনের মধ্যেই আদর্শ কয়েদী বলিয়া গণ্য হইলাম।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালা দেশের জেলসমূহ এখন সত্যাগ্রহীদের দ্বারা ভর্তি হইয়া গেল,—আর লোক রাখার জায়গা রহিল না। এই আন্দোলনে মেয়েরাও অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং নির্যাতন ভোগ করিলেন। অবশেষে সরকার আর কাহাকেও জেলে পাঠাইতেন না, প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিতেন, অথবা লরী বোঝাই করিয়া রাত্র ১২টার সময় পনের বিশ

মাইল দূর কোন এক জায়গায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আসিতেন। জেলে যদি অল্প কয়েকজন রাজনৈতিক কয়েদী থাকে তবে তাহাদের উপর আইন কানুন চালানো বা বলপ্রয়োগ করা সহজ হয়, কিন্তু বহু লোক হইলে তাহা আর চলেনা। আলীপুর জেলে আমরা "বম্ ইয়ার্ডে" (Bomb yard) ছিলাম। সত্যাগ্রহীরা যখন প্রথম আসিতে লাগিলেন, তখন আমরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না। কিন্তু যখন বহু লোকের সমাগম হইল, তখন দলে দলে যুবকেরা দেওয়াল টপকাইয়া ইয়ার্ডে আসিতে লাগিলেন। অবশেষে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগকে তাহাদের সহিত মেলামেশার সুযোগ দিলেন। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত বড় বড় নেতৃবৃন্দ আলীপুর জেলে ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলানা মুজিবর রহমন, পীর বাদসা মিঞা, চান্দমিঞা সাহেব, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চৌধুরী প্রভৃতি নেতারা সেখানে ছিলেন। আলীপুর জেলে তখন প্রায় ছয়শত সত্যাগ্রহী কয়েদী ছিলেন। নেতাদের প্রত্যেকেই বম্ ইয়ার্ডে আসিয়া আমাদের সাথে দেখা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও পরে তাঁহাদের ইয়ার্ডে গিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়াছি। নেতাদের প্রত্যেকেই আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের বাড়ী হইতে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আসিত আমরা তাহার ভাগ পাইতাম। আমরা সাত-আট বৎসর যাবৎ জেলে আছি, বাহিরের খাদ্যদ্রব্য চোখে দেখি নাই। এখন আমাদের কাছে সব জিনিষই নূতন মনে হইতে লাগিল। কলা, কমলা, রসগোল্লা, চিড়াগুড় প্রভৃতির স্বাদ আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল আমরা বাঙ্গলাদেশে এবং জেলের বাহিরে আছি, আমরা পূর্বে কখনও ইয়ার্ডের বাহিরে যাইতে পারি নাই। এখন সর্বত্র বেড়াই এবং কত লোকের সহিত কত গল্প ও আলোচনা করি তাহার ঠিক নাই। আমাদের দিন কি ভাবে যে কাটিয়া গেল তাহা টের পাইলাম না।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যুবকের দল আমাদের বাধ্য হইয়া পড়িল। ইহাতে কোন কোন উপ-নেতার গাত্রদাহ হইতে লাগিল। তাহারা গিয়া দেশবন্ধুকে বলিলেন, বোমা ইয়ার্ডের লোকেরা হিংসার কথা বলিয়া ছেলেদের মাথা বিগড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। দাশ মহাশয় তাহাদের কথায় প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই, পরে একদিন তাহাদিগকে বলিলেন, "ইহাদের কথা যখন আমার মনে হয় তখন আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়।" ইহার পর আর কেহ দাশ মহাশয়ের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহস পায় নাই। আমরা দাশ মহাশয়ের ভক্ত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একদিন তিনি আমাকে এবং শশাঙ্কবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার পাশে বসাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সুভাষবাবু আমাদের পরিবেষণ করেন। আলীপুর জেলে সুভাষবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। পরে ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে রাজবন্দী অবস্থায় আমরা একসঙ্গে ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হই ও মান্দালয় জেলে একত্র থাকি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল কলেজ ভাঙ্গার সাথে সাথে কিছু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জেলে আমি শ্রীযুক্ত শাসমলের সহিত জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিতাম। আমি বলিয়াছিলাম, স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটিও টিকে নাই এবং ঐ সকল বিদ্যালয় হইতে একটিও মানুষ বাহির হয় নাই। জাতীয় বিদ্যালয়গুলি যদি সরকারী বিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে বিদ্যালয়ের দেশে কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ হইবে ছেলেদিগকে দেশপ্রেমিক করিয়া তোলা। জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িয়া যদি জাতীয় ভাব না জাগে, দেশপ্রেম না জন্মে, তবে সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাই নহে। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা যদি দেশের কাজে না আসে, তাহাদের যদি অপর দশজনের মত চাকুরীই করিতে হয়, তবে জাতীয় বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা

দেশপ্রেমিক, নির্ভীক ও চরিত্রবান হইবে। তাহারা এরূপ শিক্ষা পাইবে যে, তাহার ফলে তাহারা দেশের সেবায় নিযুক্ত হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিবে। এ-জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন কতকগুলি পুস্তক। আমাদের দেশে জাতীয় বিদ্যালয়ের উপযুক্ত কোন পাঠ্য পুস্তক নাই। শৈশব হইতে ছেলেদের কোমল প্রাণে দেশপ্রেমের বীজ বপন করিতে হইবে,—এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতেই জাতীয় শিক্ষা আরম্ভ করা দরকার। বীরেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার মেদিনীপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা আছে ও আমার উপর তিনি সংগঠনের ভার দিবেন। তিনি আমাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক লিখিতে উপদেশ দিলেন। আমি প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম ভাগ পর্যন্ত লিখিলাম। আমার পাণ্ডুলিপি তিনি মাঝে মাঝে দেখিতেন এবং যে সব জায়গায় মনে করিতেন সরকার হইতে আপত্তি হইতে পারে সে-সব জায়গা পরিবর্তন করিতে বলিতেন, এবং আমি তাহা পরিবর্তন করিয়া দিতাম। আমার লেখার কথা ইতিমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং একদিন হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় দাশ মহাশয়কে এই সংবাদ দিলেন। দাশ মহাশয় এই সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং খাতাগুলি দেখিতে চাহিলেন। আমি খাতাগুলি দাশ মহাশয়কে দিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া বলিলেন, "আমার একটি প্রাইমারী এডুকেশন স্কীম আছে, খাতাগুলি তুমি আমাকে দাও।" আমি খাতাগুলি দাশমহাশয়কে দিলাম। সুভাষবাবুও ইহা জানিতেন। দাশ মহাশয় মুক্ত হওয়ার সময় খাতাগুলি সঙ্গে লইয়া যান। অবশ্য আমার নিকটও আর এক কপি ছিল।

বন্যায় এখন আবার ভাঁটা পড়িল, ন'মাসে স্বরাজের তারিখ অর্থাৎ ৩১শে মার্চ পার হইয়া গেল কিন্তু স্বরাজ আসিল না। অনেকেই নিরাশ হইয়া পড়িল। পূর্বে প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিত ৩১শে মার্চের পর আর কাহাকেও জেলে থাকিতে হইবে না, আমাদিগকেও মহাত্মা গান্ধী জেল হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু কার্যতঃ সেরূপ কিছুই হইল

না। সত্যাগ্রহীরা সকলেই জেল হইতে একে একে বাহিরে গেল, কেহই পুনরায় ফিরিয়া আসিল না,—শুধু আমরাই জেলে রহিলাম। এই সময় আমি গীতার ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিলাম। জেলে আমি স্বামী কৃষ্ণানন্দ, তিলক মহারাজ, বঙ্কিমবাবু এবং আরও অনেকের গীতার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা গীতাভাষ্যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন খুব, কিন্তু আমার তাহা পছন্দ হয় নাই। আমি গীতার শঙ্করভাষ্যও দেখিয়াছি। আমার মনে হইল, সকলেই নিজ নিজ মত গীতার মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। আমার ইচ্ছা হইল, আমিও আমার মনোমত গীতার ভাষ্য লিখিব,—আমি গীতার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করিলাম। গীতা আমাদের দেশে সকলেই পড়েন, এমন কি গীতা পাঠ না করিলে হিন্দুর শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপ্ত হয় না। আমার মতে গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথমত দেখিতে হইবে, কোন সময় গীতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া অর্জুন কি করিলেন! যখন উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তখন অর্জুন দেখিলেন এই যুদ্ধে বহু লোক ক্ষয় হইবে,—আত্মীয়-স্বজনদিগকে হত্যা করিতে হইবে—এবং ভারত বীরশূন্য হইয়া পড়িবে। তিনি স্থির করিলেন যুদ্ধ করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বলিলেন, "তুমি ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর, ইহা তোমার মত লোকের শোভা পায় না।" তিনি তখন সমস্ত বেদ বেদান্ত মন্থন করিয়া জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের আলোচনা করিয়া অর্জুনকে ইহাই বুঝাইলেন, "তোমার পৈত্রিক রাজ্যের পুনরুদ্ধার করাই তোমার একমাত্র ধর্ম।" শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের সংশয় দূর হইল। তিনি "আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে" বলিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জুন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্বক কোন নির্জন পাহাড়ের উপর যাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, অথবা ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্বক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রেম বিতরণ করেন নাই,—তিনি যুদ্ধ করিয়াই পৈত্রিক রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন,—আমার নিকট ইহাই গীতার সারমর্ম। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রকৃত উপদেষ্টা, আর অর্জুন ছিলেন উপযুক্ত শ্রোতা,—তাই

গীতার উপদেশ কার্যকরী হইল ও দেশে হইল ধর্মরাজ্য স্থাপন। আমাদের দেশে যাঁহারা গীতা পাঠ করেন তাহাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন "আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে,—আমি এখন আমাদের পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত হইব,—দেশে ধর্মরাজ্য স্থাপন করিব এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করিব?" আমাদের দেশে সাধারণতঃ সাধু সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই গীতা পাঠ করেন এবং মনে মনে গর্ব বোধ করেন যে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। আমিও ছোটবেলা গীতাপাঠ করিয়া এরূপ মনে করিতাম। আমার দাদা মহাশয় প্রত্যহ দিবানিদ্রার পর বৈকালে কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিতেন। আমি "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান" অথবা এই অধ্যায় পাঠ করিলে এরূপ পুণ্য হইবে ইত্যাদি শুনিয়া ভাবিতাম এত সস্তায় যখন পুণ্য সঞ্চয় হয়, তখন আমি ইহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন? দ্বিপ্রহরে আমার দাদামহাশয় যখন শুইয়া থাকিতেন তখন আমি তাঁহার মহাভারতখানা চুরি করিয়া পড়িতাম এবং মনে মনে গর্ববোধ করিতাম এই ভাবিয়া যে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিলাম। এখন বুঝি বই পড়িলেই পুণ্য সঞ্চয় হয় না। মরুভূমিতে বসিয়া "জল জল" চীৎকার করিলেই জল পাওয়া যায় না, কষ্ট করিয়া জল সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা চাই সহজে পুন্য সঞ্চয় করিতে। কষ্ট করার প্রবৃত্তি নাই, তাই আমাদের পুন্যও সঞ্চয় হয় না—দুঃখও মোচন হয় না। আলীপুর জেলে আমি গীতার চারি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করি। আমি গীতার শ্লোকের সাধারণ ব্যাখ্যা লিখিয়া 'ভাবার্থে' আমার মত গীতার মধ্য দিয়া—অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লোক বলার এই অভিপ্রায় ছিল" এইভাবে চালাইয়া দিয়াছি। ১৯২৪ সনে মুক্ত হইবার পর আমি মাত্র অল্প কয়েক মাস বাহিরে ছিলাম। কাজেই এই দিকে মন দিতে পারি নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কারামুক্তি ও শিক্ষকতা

১৯২৪ সনের প্রথম ভাগে মুক্তির পূর্বে আমাকে আলীপুর জেল হইতে ময়মনসিংহ জেলে পাঠান হয়। সেখান হইতে মুক্ত হইয়া বার বৎসর পর বাড়ী যাই। বাড়ী গিয়া যখন আমি প্রথম মেজদাকে প্রণাম করিলাম, তিনি তখন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার পরিচয় দেওয়ার পর বাড়ীতে ও গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। গ্রামের ও আশে পাশের গ্রামের বহুলোক আমাকে দেখিতে আসিল, অনেকের সাথেই তখন আবার নূতন করিয়া পরিচয় হইল। লোকজন রাস্তাঘাট সবই আমার কাছে নূতন ঠেকিল। বার বৎসরের ব্যবধান কম নয়, ইহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বাড়ীতে আমি দুই তিন দিনের বেশী থাকিতে পারিলাম না। বাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের তাগিদ আসিল। তাহাদের সহিত দেখা করার জন্য ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি হইয়া কলিকাতা গেলাম। মদনবাবু পূর্বে মুক্ত হইয়া কলিকাতায় একটি মেস খুলিয়াছিলেন। আমি সেখানেই উঠিলাম। ইতিমধ্যে আবার ধরপাকড় সুরু হইয়া গেল। একদিন আমি দাশমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়"-এর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, তুমি কিছুদিন সেখানে থাক। ভাবিলাম, একটা হাইস্কুল আমার হাতে আসিবে, ইহা মন্দ কি ? আমি রাজী হইলাম। ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন চণ্ডীবাবু। তিনি এম, এ, বি, এল। চণ্ডীবাবু, স্কুলের সেক্রেটারী এবং আরও দুই একজন স্কুল কমিটির সভ্য দাশমহাশয়ের মুখে আমার প্রশংসা শুনিয়া আমাকে খুব আদর যত্ন করিয়া স্কুলে লইয়া গেলেন। প্রথম দিন স্কুলে যাইয়া ছাত্রদের চেহারা দেখিয়া আমার মনে হইল, ইহা কি আমার পূর্বের মাইনর স্কুল ? আমি গত দশ বৎসরের মধ্যে ছোট ছেলে দেখি নাই। এখন

দেখিলাম এই দশ বৎসরে ছেলেদের পুষ্টি-বৃদ্ধি অসম্ভব রকম কমিয়া গিয়াছে। আমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কোন ক্লাসে পড়ে। কেহ বলিল সেকেণ্ড ক্লাস, কেহ বা থার্ড ক্লাস। আমার কিন্তু মনে হইল, ইহারা পড়ে ফিপথ ক্লাসে বা তারও নীচে, উপরে ত নয়ই। আমিও একসময় হাইস্কুলে পড়িয়াছি, কিন্তু এমন চেহারার ছেলেত' দেখি নাই। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার বয়স কত,—উত্তরে সে বলিল ষোল বৎসর। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বয়স কিছুতেই ষোল হইতে পারে না—এগার বৎসর। সে বলিল, আমি তবে স্যার, সেকেণ্ড ক্লাসে কি করিয়া পড়ি? আমার মনে হইতে লাগিল এই দশ বৎসরে দেশ কতটা গরীব হইয়া পড়িয়াছে। এই যে দেশের ছেলেদের পুষ্টি, বৃদ্ধি কমিয়া গিয়াছে, ইহার কারণ দেশের দারিদ্র্য। এইভাবে যদি কয়েক পুরুষ চলে তবে, আমাদের প্রবাদ বাক্য সফল হইবে,—লোকে 'কোটা দিয়া বেগুণ পাড়িবে।' আমাকে একবন্ধু বলিয়াছিলেন, আমার মা বাপ আমাকে যাহা খাওয়াইয়াছেন আমি তাহা আমার ছেলেমেয়েদিগকে খাওয়াইতে পারিব না,—আর আমি যাহা তাহাদিগকে খাওয়াইয়া গেলাম, তাহারা তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে তাহা খাওয়াইতে পারিবে না। ইহা অতি সত্য কথা। পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যেরূপ স্বচ্ছল অবস্থা ছিল, এখন তাহা নাই, দেশ ক্রমশঃই গরীব হইয়া পড়িতেছে; এরূপ ভাবে আর কতদিন চলিবে?

আমি মনে করিয়াছিলাম দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করিয়া বেতন লইব না, কারণ বিদ্যাদান করাই উচিত, বিক্রয় করা উচিত নয়। আমাদের প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মুনিঋষিদের তপোবন। সেখানে বিদ্যা বিক্রয় করা হইত না, দান করাই হইত। আমাদের দেশীয় টোলে এখনও এই প্রথা বর্তমান আছে। আমি মদনবাবুর মেসে খাই, থাকি, পয়সা লাগেনা—কিন্তু সার্পেণ্টাইন লেন হইতে প্রত্যহ হাটিয়া হরিশ মুখার্জী রোডে (৪।৫ মাইল) যাওয়া আসা খুব কষ্টকর। ট্রাম ভাড়ার জন্য আবার কাহার নিকটই বা হাত পাতি? একদিন আমি বীরেন্দ্র শাসমল মহাশয়ের সাথে দেখা করিতে যাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি করি। তিনি

আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনি আমার বাসায় ডাল ভাত খাইবেন, থাকার জায়গা কম, একটু অসুবিধা হইবে। আমি আশ্বস্ত হইলাম, তাঁহার বাসা স্কুলের পাশেই ছিল, ইহার পর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের বাসায় আমার একটা আড্ডা হইল।

গড়পাড়া মাইনর স্কুলের মাষ্টারী করার চৌদ্দ বৎসর পর আবার মাষ্টারী সুরু করিলাম। এখানেও আমি তিন মাস মাষ্টারী করিয়াছি। এই স্কুলে ফাষ্ট ক্লাসে একটি এবং সেকেণ্ড ক্লাশে বিশ পঁচিশটি ছাত্র ছিল এবং এই সেকেণ্ড ক্লাসই ছিল আমার প্রিয় ক্লাস। স্কুলে আসার প্রথম দিনই হেডমাষ্টারবাবু আমাকে বলিলেন, আপনি যে ক্লাসে যে বিষয় ইচ্ছা পড়াইতে পারেন এবং কোন ক্লাসে কোন বিষয় পড়াইবেন, তাহা বলুন। আমি দেখিলাম আমার পক্ষে ইতিহাস পড়ান সহজ হইবে। আমি বলিলাম, উপরের চারি ক্লাসে ইতিহাস পড়াইব এবং ফিপথ ক্লাসে পড়াইব ইংরাজী। 'ইনফ্যাণ্ট' ক্লাসেও একঘণ্টা পড়াইতে চাহিলাম। চণ্ডীবাবু ও অন্যান্য শিক্ষকগণ ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। এখানে নিশ্চিন্তমনে আমি শিক্ষকতার কাজ করিতে লাগিলাম। এখানে ইনস্পেক্টর মহিম বোস মহাশয়ের স্কুল পরিদর্শনের আতঙ্ক নাই, ফাষ্ট ক্লাসের ছেলেকে অঙ্ক কষানোরও ভয় নাই। আমি এখন ইতিহাস পড়াই। ইতিহাস পড়াইতে আমার কোন বেগ পাইতে হয় না। জেলখানায় আমি বহু ইতিহাস পড়িয়াছি। গ্রীস, রোম, ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস এবং অন্যান্য যায়গার আরও অন্যান্য ইতিহাস পড়িয়াছি। আমি রমেশ দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, মূল রামায়ণের অনুবাদ, বাইবেল, ধম্মপাদ, কোরাণ ইত্যাদি সবই পড়িয়াছি। আন্দামানে অধ্যাপক বালকৃষ্ণ দেবের হিন্দীতে 'ভারতবর্ষ কা ইতিহাস' পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় কাহিনী ছিল, তাহাতে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধজাহাজ 'বেগিণী', 'মন্থরা' ইত্যাদির কথাও উল্লেখকরা হইয়াছে। ইতিহাস পড়াইবার সময় আমি ছেলেদিগকে, বিশেষতঃ ফাষ্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসে গ্রীক ও রোমাণদের বীরত্ব কাহিনী, তাহাদের দেশপ্রেম এবং প্রাচীন ভারতের

গৌরবময় ইতিহাসের কথা বলিতাম। আমি বলিতাম, প্রাচীন ভারতে আমাদের যুদ্ধ জাহাজ, হাওয়াই জাহাজ, ও বেতার বার্তার প্রচলন ছিল; ভারতবাসী সর্বপ্রথমে আমেরিকা আবিষ্কার করে, জাপান আবিষ্কার করে; ভারতীয় বাণিজ্যপোত পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিত। আমার ছাত্ররা আমার নিকট এই সব গল্প শুনিয়া, খুব উৎসাহের সহিত বাড়ী যাইয়া তাহাদের অভিভাবকদের নিকট বলিত, "আমাদের আন্দামান ফেরৎ এক নূতন মাষ্টার আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন প্রাচীন ভারতে আমরা এতটা উন্নত ছিলাম। ছাত্রদের অভিভাবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহা বিশ্বাস করিতেন, কেহ কেহ বা করিতেন না। তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, তোদের মাষ্টার এইসব গাঁজাখুরি গল্প কোথা হইতে পাইলেন—হয় নজীর দেখাইতে হইবে নতুবা বিশ্বাস করিনা। তখন ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের অভিভাবকদের নিকট অপদস্থ হইয়া আমাকে ধরিল নজীর দেখাইতে হইবে। কয়েকটি ছাত্র আমাকে খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, "স্যার, আপনি কোথায় এইসব পাইয়াছেন, তাহার নজীর দেখাইতে হইবে।" বাড়ী গেলে সকলে ঠাট্টা করে ও বলে, "আজ তোদের আন্দামান ফেরৎ মাষ্টার কোন গাঁজাখুরি গল্প করিলেন?" নজীর আমার পকেটে ছিল না। আমি নজীর কোথা হইতে দেখাইব? আমার এতটাকা বা সময় নাই যে, আমি সেই সব বই ক্রয় করিয়া, তাহাদের দেখাইয়া আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারি। আমি ছেলেদিগকে কতকগুলি পুস্তকের নাম করিয়া বলিলাম, তাহাদিগকে বলিও, তাহারা যেন বাজার হইতে এই সব বই ক্রয় করিয়া পড়েন। অবশ্য আমার এই কথায় ছেলেরা বা তাহাদের অভিভাবকগণ কেহই সন্তুষ্ট হয় নাই।

আমি ছাত্রদিগকে খুব স্বাধীনতা দিতাম। আমার ছাত্ররা কখনও কখনও বলিত, স্যার! আজ আমাদের পড়া বন্ধ, আমরা আজ আপনার কাছ থেকে আন্দামানের গল্প শুনিব; আবার কখনও তাহারা বলিত, আজ আমরা বক্তৃতা দিব; অথবা রচনা লিখিব। আমি তাহাদের ফরমাইস মত কাজ করিতাম।

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াইবার সময় মাঝে মাঝে যখন দেখিতাম ছেলেদের পড়ার দিকে মন নাই, তখন তাহাদিগকে বলিতাম, তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া পাঁচ মিনিট দুষ্টামি কর,—তোমরা যাহা খুসি তাহাই করিতে পার, কিন্তু কথা বলিতে পারিবে না, গণ্ডগোল হইলে অপর ক্লাসের ক্ষতি হইবে। তাহারা ধাক্কাধাক্কি ও মাটিতে গড়াগড়ি করিত, এবং তাহাদের মুখে আনন্দে চাপাহাসি ফুটিয়া উঠিত। আমি বসিয়া বসিয়া তামাসা দেখিতাম। আবার কিছুক্ষণ বাদে তাহাদিগকে মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম করিতে বলিতাম। তারপর আবার পড়া সুরু হইত। আমার মনে হইত, অত্যধিক পড়ার চাপে ছেলেরা এখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মন আমোদ প্রমোদের দিকে চালিত করিলে আবার সতেজ হইবে ও পড়ায় মন বসিবে।

'ইনফ্যাণ্ট' ক্লাসের ছাত্রেরা দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই আমাকে চিনিয়া ফেলিল এবং আমাকে তাহাদেরই দলের একজন বলিয়া মনে করিয়া লইল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, ছেলেদিগকে কখনও প্রহার করিব না, খুব আদর করিয়া ডাক দিব। যখনই আমি "ইনফ্যাণ্ট" ক্লাসের দরজার সম্মুখে যাইতাম, ছাত্ররা তখনই একসঙ্গে দৌড়াইয়া আসিয়া কেহ আমার হাত, কেহ জামা কেহবা কাপড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইয়া আমাকে চেয়ারে বসাইয়া দিত এবং একসঙ্গে সকলেই বই লইয়া আসিয়া আমার নিকট পড়া দেওয়ার জন্য ভিড় করিত। আমার নিকট পড়া দেওয়ার আর একটা কারণ ছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পড়া দিলে মার খাইবার ভয় ছিল, কিন্তু আমার নিকট সেই ভয় ছিল না। আমার ক্লাসে এত গণ্ডগোল হইত যে অপর ক্লাসে পড়ানো অসুবিধা হইত। ছাত্ররা আমার কোন কথা শুনিত না, গণ্ডগোল করিতে নিষেধ করিলে তাহারা গ্রাহ্যই করিত না, ধমক দিলে তাহারা হাসিত। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন পণ্ডিত মহাশয় বেত্র হস্তে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ধমক দিয়া বলিতেন, "এখানে কি বাঁদর নাচ হচ্ছে" তখন সকলেই ভয়ে চুপ হইয়া যাইত, কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইত না। আবার যে-ই মাত্র পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া যাইতেন,

আস্তে আস্তে গণ্ডগোল সুরু হইত। কিছুতেই আমি গোলমাল বন্ধ করিতে পারিতাম না,—উপরের ক্লাসেও গণ্ডগোল হইত, হেডমাষ্টার মহাশয়েরও এসম্বন্ধে বদনাম ছিল। অন্যান্য মাষ্টার মহাশয়েরা আমাকে খাতির করিয়া কিছু বলিতেন না, কিন্তু হেডমাষ্টার সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে, তিনি ক্লাস পরিচালনা করিতে জানেন না।

স্কুলে ছাত্ররা চরকায় সূতা কাটিত। আমি সূতা কাটিতে জানিতাম না, তাহাদের সহিত বসিয়া সূতাকাটা অভ্যাস করিতাম, ছাত্ররা আমার সূতা কাটা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিত 'স্যার, আপনি এতবড় স্বদেশী, আন্দামান ফেরত, আপনি সূতাকাটা জানেন না?' সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিত, যে সূতাকাটা জানে না সে আবার কিসের স্বদেশী। একদিন আমাদের স্কুলে গোপীনাথ সাহার ফাঁসী উপলক্ষে শোকসভা হইল। স্কুলের ছাত্ররা হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট একখানা লিখিত দরখাস্তে জানাইল যে, তাহারা ঐ দিনের সভায় তাহাদের নূতন আন্দামান ফেরৎ মাষ্টার মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে চায়। অন্যান্য শিক্ষকগণও আমার বক্তৃতা শুনিতে চাহিলেন। আমি ইহাতে বড়ই বিপদে পড়িলাম। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস আমাদের নাই, পূর্বে কোন সভায়ও যোগ দেই নাই। অন্যভাবে গড়া আমরা। কিন্তু সকলেই নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল, আমার বক্তৃতা শুনিবে। যথাসময়ে সভা আরম্ভ হইল। চণ্ডীবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভায় স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ ছাড়া অন্য কোন লোক উপস্থিত ছিলো না। চণ্ডীবাবু আমাকে বক্তৃতা করিতে বলিলেন,—আমি বলিলাম, পরে বলিব। ক্রমাগত 'পরে পরে' করিতে করিতে যখন সকল বক্তার বক্তৃতা শেষ হইল, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে দাঁড়াইতে হইল। আমি পাঁচ মিনিট বলিয়া, বসিয়া পড়িলাম। এই হইল আমার প্রথম বক্তৃতা। আমি যেভাবে এবং যাহা বলিলাম, সেজন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। সকলেই ভাবিয়াছিল আন্দামান ফেরৎ বিপ্লবী না জানি কি বলে, কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িল।

আমি যখন দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করি, তখন যতীন দাস মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা করিয়াছে, আমিও সময় সময় তাহাদের বাড়ী গিয়াছি, মাঝে মাঝে রাত্রে সেখানে কাটাইয়াছি। যতীনের সেবা যত্ন ভুলিবার নয়। যতীন ছিল নির্ভীক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ৬৩ দিন অনশনের ফলে জেলে যতীনের মৃত্যু হয়। পূর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের জেলে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না, সকলকেই সাধারণ কয়েদীর মত থাকিতে হইত। যতীনের অনশনের ফলে দেশব্যাপী যে তীব্র আন্দোলন দেখা দেয় তাহারই ফলে জেলে শ্রেণীবিভাগ হয়। অবশ্যই যতীন চাহিয়াছিল, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে একটা বিশেষ শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিতে। যতীন অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল। যতীন দাসের মৃত্যুর পর তাহার শবের শোভাযাত্রায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

আমরা মাঝে মাঝে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইতাম। একদিন প্রাতে আমি, কুলদাবাবু এবং আরও দুইজন শিক্ষক চণ্ডীবাবুর বাসায় গেলাম। আমরা একসঙ্গে বাহির হইব, চণ্ডীবাবু তখনও নিদ্রিত ছিলেন। আমি চণ্ডীবাবুর বাবাকে বলিলাম, একটু অনুগ্রহ করিয়া চণ্ডীবাবুকে ডাকিয়া দিন। চণ্ডীবাবুর বাবা ছিলেন একজন বড় ডাক্তার। তিনি বলিলেন, সে যখন এখন পর্যন্ত ঘুমাইয়া আছে, তখন আমি তাহাকে জাগাইতে পারিব না। তার ঘুমাইয়া থাকার অর্থ তার system এখনও ঘুম চায়। চণ্ডীবাবুর 'সিষ্টেম' যে কতক্ষণ ঘুম চাহিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই—সেটা বেলা দশটা পর্যন্তও হইতে পারে। আমি সেই বাসার একটি ছেলেকে বলিলাম, শীঘ্র চণ্ডীবাবুকে জাগাইয়া দিতে। সে চণ্ডীবাবুকে জাগাইয়া দিল—আমরা একসঙ্গে বাহির হইলাম। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট গেলাম। শরৎবাবু আমাদের নিকট স্কুলের অবস্থা শুনিয়া দেড়শত (১৫০৲) টাকার একখানা চেক দিলেন। এত টাকা যে পাইব তাহা আমরা কল্পনাই করি নাই।

দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে তখন শিখ ও হিন্দুস্থানী ছাত্র অনেক

ছিল এবং তাহাদের জন্য একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত ছিলেন। উনি যখন অনুপস্থিত থাকিতেন, তখন আমিই তাহাদিগকে হিন্দী এবং গুরুমুখী পড়াইতাম। মাঝে মাঝে আমি দেশবন্ধুর সাথে দেখা করিতাম। আমার লিখিত খাতাগুলি সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই,—ভাবিয়াছিলাম যখন তিনি সুবিধা মনে করেন, তিনি নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, শরীরও তাঁহার অসুস্থ ছিল। বীরেন্দ্রবাবুকে (শাসমল) একদিন তাঁহার মেদিনীপুরের প্রাইমারী শিক্ষার পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই। শিক্ষকতার কাজ আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু বেশীদিন একাজে থাকিতে পারি নাই। পুলিশ আমার পিছনে লাগিয়াই ছিল—সর্বদা আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিত। এদিকে বহু লোক বিনা বিচারে আটক হইয়াছে। আমার চারিদিকে একটু যাওয়ার প্রয়োজন। তাই স্থির করিলাম, গ্রীষ্মের বন্ধের পর আর স্কুলে আসিব না। আমার হাতে টাকা ছিল না। স্কুল বন্ধের কয়েকদিন পূর্বে আমি হেডমাষ্টার মহাশয়কে বলিলাম, আমি একমাসের বেতন চাই। আমি তিন মাস মাষ্টারী করিয়াছি। পূর্বে বেতনের টাকা চাই নাই—এখন বাধ্য হইয়া বিশ টাকা গ্রহণ করিলাম। বন্ধের পর আর স্কুলে আসি নাই। পুলিশ এখন অনুসন্ধান করিতে লাগিল আমি কোথায় আছি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জেলে চতুর্থবার

ইতিমধ্যে আমার নামে তিন আইনের ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। পুলিশ আমার অনুসন্ধান করে। আমি কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা সর্বত্রই যাতায়াত করি। আই, বির লোকের সাথে রাস্তায় দেখাও হয়। তাহারা আমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না,—আমি মনে মনে হাসি। পূজার পর কয়েক দিন ধরিয়া আমি ময়মনসিংহে আছি। ওখানকার আই, বি ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর প্রত্যেককেই চিনি, কিন্তু তাহারা আমাকে চিনিত না। কাজেই প্রকাশ্য ভাবেই আমি চলাফিরা করিতাম। একদিন রাত্রে ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় এগারটার সময় ননীর বাসায় যাই। 'ননী' আই, এস, সি পড়িত। তাহার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করার পর মনে হইল এত রাত্রে আর কোথায় যাই। আমি তাহার বিছানায় তাহার সাথে শুইয়া পড়িলাম। এদিকে পুলিশ ঠিক করিয়াছে শেষ রাত্রে এবাড়ী তল্লাসি করিবে,—আমার জন্য নয়, অস্ত্র-শস্ত্র বা অন্য কিছু যদি পায়। আমি পূর্বে কোন সন্দেহ করি নাই। নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া আছি, শেষরাত্রে পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিল। প্রাতে পুলিশ দরজা ধাক্কা দিতে লাগিল,—ননী দরজা খুলিয়া দিল। আমাকে দেখাইয়া পুলিশ ননীকে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? উত্তরে ননী বলিল, আমার কাকা—বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। যে কাকার বাসায় ননী থাকিত তিনি একজন সরকারী স্কুল মাষ্টার। আমি মনে করিলাম, পুলিশ যখন ননীর কাকাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি তখন অবশ্যই বলিবেন, আমাকে চিনেন না। আমি তাই পলাইবার চেষ্টায় রহিলাম। ননীর উপরই পুলিশের নজর খুব বেশী ছিল। এই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলাম। দারোগাবাবু

জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যান? আমি বলিলাম, মুখ ধুইতে। তিনি বলিলেন, শুনুন। আমি দিলাম ভোঁ দৌড়। আমার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ দৌড় দিল—কিন্তু আমি তখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছি। পিছনে ফিরিয়া যখন দেখিলাম রাস্তায় লোক নাই, তখন সাধারণভাবে বিভিন্ন রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় আসিয়া হঠাৎ দেখিলাম, আমার সম্মুখে একদল পুলিশ—তাহারা আমারই অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে। এখন আমাকে পাইয়া মহানন্দে তাহারা আমাকে ননীর বাসায় লইয়া গেল। ননীর কাকা বলিলেন, তিনি আমাকে চিনেন না। ইন্সপেক্টর বাবু আমার নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, পুলিশের লোককে আমি খুব ঘৃণা করি, কাজেই আমি কোন কথা বলিব না। তাহাদের সন্দেহ হইল আমি একজন পলাতক আসামী। ননী কিছুই স্বীকার করিল না, এজন্য তাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল এবং আমার বিষয় জানিবার জন্য ননীকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে ও নানা হিতোপদেশ দিতে লাগিল। ননী বলিল, 'আপনারা কেন আমার পিছনে লাগিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আমি কিছু জানি না।' সে আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই ভদ্রলোককে ত একটা প্রশ্নও করিতেছেন না।' তাহারা বলিল, যে নিজের নামই বলে না তাহাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব? আই, বির কর্মচারীরা চারিদিক হইতে লোক আনাইয়া আমাকে সনাক্ত করাইতে লাগিল; অবশেষে প্রমাণ হইল, আমি ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী। সেইদিনই আমাকে কলিকাতা চালান দিল। ননীকে থানায় রাখিয়া তাহার পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল। ননীর পিতা শ্রীযুক্ত তারিণী চৌধুরী মহাশয় ঈশ্বরগঞ্জে ওকালতি করিতেন। ননী তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি জানিতেন, ননী দুর্বলতা দেখাইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, পুলিশ তাঁহাকে এইজন্যই আনাইয়াছে। কিন্তু ননীর পিতা তাহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, 'তুমি কোন রকম দুর্বলতা দেখাইয়া কাহারও সর্বনাশ করিও না বা বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।' পিতার মুখ হইতে সচরাচর এরূপ কথা বাহির হয় না। ননী কোন প্রকার

দুর্বলতা দেখাইল না, ফলে তাহাকে বিনাবিচারে চারি বৎসর আটক থাকিতে হইল। ননী এখন প্রফেসার।

দশ বৎসর জেল খাটার পর দশমাসও বাহিরে থাকিতে পারিলাম না। ১৯২৪ সনের শেষভাগেই আবার ধৃত হইলাম। ময়মনসিংহ হইতে আমাকে কলিকাতায় 'ইলিশিয়াম রো'তে (এখন লর্ড সিংহ রোড) লইয়া যাওয়া হইল, এবং সেখানে আই, বি-র বড় বড় কর্মচারীরা আমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া আবার আলীপুর জেলে পাঠাইয়া দিলেন। এখন আমি কয়েদী নই—সম্মানী অতিথি,—ষ্টেট প্রিজনার। এখন আর জেলার, স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে গেলে পূর্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় না—বসার জন্য চেয়ার পাই। ইতিমধ্যে আমার বড় ভাইপো শ্রীমান জিতেন্দ্র আমার সাথে দেখা করিতে আসে। সে তখন "বেঙ্গল টেকনিক্যাল"-এ পড়ে। আমাদের দেখা হওয়ার সময় মহম্মদ ইউসুফ নামে একজন আই, বি ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, আমরা দূর হইতে পরস্পরকে দেখিতে পারিব, কিন্তু কথা বলিতে পারিব না, কারণ শ্রীমান তাহার দরখাস্তে লিখিয়াছিল "I wish to see my uncle." এবং ইহাই মঞ্জুর করা হইয়াছে। দরখাস্তে দেখা করার কথা আছে,—কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কাজেই আমরা কেবল দেখাই করিতে পারিব। কিন্তু কথা বলিতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। ইহার একমাস পর, ১৯২৪ সনের শেষভাগে, আমি মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত হই। ওখানে যাইয়া বাঙ্গালা সরকারের নিকট আমার ভাইপোর সহিত দেখা করার সময় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল,—অর্থাৎ দেখা করিতে পারিব, কথা বলিতে পারিব না,—তাহা লিখিয়া জানাই। আমার ঐ দরখাস্তে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটু তীব্র সমালোচনাও ছিল—কিন্তু ঐ দরখাস্তের আমি কোন উত্তর পাই নাই। ইহার কিছুদিন পর ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত হই। মেদিনীপুর জেল হইতে আমি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছি এবং তথা হইতে আমাকে লালবাজার লইয়া যায়। সেখানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু,

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও মদনমোহন ভৌমিক প্রভৃতির সহিত মিলিত হই। তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে রেঙ্গুনগামী জাহাজে গিয়া উঠি। আমাদের সঙ্গে গেলেন স্বয়ং লোম্যান সাহেব। জাহাজে আমরা তিনদিন ছিলাম এবং খুব আনন্দে কাটাইয়াছি। আন্দামান যাওয়া ও আসার সময়ে সমুদ্রে খুব ঢেউ ছিল, কিন্তু এবার আর ঢেউ নাই। সমুদ্রবক্ষ হইতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত খুব ভাল দেখা গেল। জাহাজে আমরা সকালে ও বিকালে বেড়াইতাম। আই, বি-র দারোগাবাবুরা আমাদিগকে চোখে চোখে রাখিতেন, বন্দুকধারী প্রহরীও ছিল। একদিন বিকালে আমি ও সত্যেনবাবু বেশ দ্রুত গতিতে বেড়াইতেছি, দারোগাবাবু একটু দূরে বসিয়াছিলেন—এমন সময় লোম্যান সাহেব উপরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দারোগাবাবুর খুব ভয় হইল। তিনি যে দূরে আছেন, লোম্যান সাহেব বুঝি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার চাকুরী যাইবে! পরে তিনি অপর দারোগাবাবুদিগকে বলিতেছিলেন, 'মহারাজের (আমি) সহিত সত্যেনবাবুর দেখা হইলে তাঁহাদের ভ্রমণের গতি এত দ্রুত হয় যে, তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে ঘোড়ায় প্রয়োজন হয়'। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, আমাদের জন্য তিনি মারা যাবেন। আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলিলাম, 'আপনি কোন চিন্তা করিবেন না,—লোম্যান সাহেবের সহিত আমার খাতির আছে,—যদি তিনি আপনাকে কিছু বলেন, তবে, আমি আপনার জন্য সুপারিশ করিব'। উত্তরে তিনি বলিলেন, 'বেশ পরামর্শ দিলেন, আপনি যদি সুপারিশ করেন তবে এখুনিই আমার চাকুরী যাইবে—আর বিলম্ব হইবে না'।

রেঙ্গুন হইতে আমরা মান্দালয় জেলে যাই। মান্দালয় জেল মান্দালয় ফোর্টের ভিতর এবং রাজা থিবোর প্রাসাদের নিকট। মান্দালয় জেলে আমরা তেরজন একত্র ছিলাম। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকায় থাকিয়া পড়িতেন এবং অনুশীলন সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। মান্দালয় জেলে পৌছানর পরই সুভাষবাবু বলিয়াছিলেন, মহারাজের সিট আমার পাশে থাকিবে এবং সুভাষ বাবুর পাশে আমার থাকার সৌভাগ্য

হইয়াছিল। সুভাষবাবুর জন্ম বড় ঘরে, শৈশব হইতে তিনি সুখে লালিত পালিত হইয়াছেন। কিন্তু দেশের জন্য দুঃখ কষ্ট বরণ করিতে তিনি কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি অম্লানবদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তিনি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কোন আপত্তি নাই তাঁহার—যাহা পান তাহাই খান। চাকর-বাকরদের উপরও তাঁহার ব্যবহার খুব সদয়, কখনও কটু কথা বলেন না। কাহারও অসুখ হইলে তিনি নিজে সারারাত্রি জাগিয়া সেবা করিতেন। একবার টেনিস খেলিতে যাইয়া আমি পড়িয়া যাই।—তাহাতে হাঁটুর চামড়া উঠিয়া যায় ও ঘা হয়। সুভাষবাবু প্রত্যহ নিজহাতে আমার ঘা নিম পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিতেন। খেলা, হৈ, চৈ, আমোদ প্রমোদ সবটাতেই তাঁহার বেশ উৎসাহ ছিল। কয়েদীরা খালাসের সময় সুভাষবাবুর কাছে কাপড় জামা চাহিত। তিনি কাহাকেও 'না' বলিতে পারিতেন না। সুভাষবাবুর মত লোককে জেলখানায় সঙ্গী হিসাবে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়।

মান্দালয় জেলে আমরা পূজার টাকার জন্য অনশন করি। অনশন ব্রতে সকলেরই খুব উৎসাহ ছিল। চৌদ্দ দিন অনশন করার পর সরকার আমাদের দাবী স্বীকার করিলেন, এবং আমরা অনশন ভঙ্গ করিলাম। মান্দালয় জেল হইতে আমাকে ইনসিন জেলে পাঠান হয়,—ইনসিন জেল হইতে পুনরায় মান্দালয় জেল ও পরে মিঙ্গান জেলে যাই। মিঙ্গান জেলে আমরা দুই জন ছিলাম। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত দস্যুনেতা সামফে সেই জেলে ছিল। আমাদের কাজকর্ম ব্রহ্মদেশীয় কয়েদীরাই করিত, সুতরাং কাজ চালাইবার উপযুক্ত কিছু কিছু ব্রহ্মভাষা শিখিয়াছিলাম। আমরা মাঝে মাঝে গোপনে সামফের সহিত দেখা করিয়া ব্রহ্মভাষায় গল্প করিতাম। সে আমাদের খুব বাধ্য হইয়া পড়িল। কিছুদিন পর সামফের ফাঁসী হইয়া গেল। আমরা তখন ইনসিন জেলে চলিয়া গিয়াছি। দ্বিতীয় বার যখন আমি মান্দালয় জেলে যাই, লোম্যান সাহেব তখন আমাদের মন পরীক্ষার জন্য সেখানে যান। তিনি একে একে সকলকে আফিসে ডাকাইয়া আলাপ করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম,

আমাকে কেন আটক রাখা হইয়াছে? তিনি বলিলেন "পাছে তোমরা হিংসামূলক কার্য আরম্ভ কর।" আমি বলিলাম, 'আমি বা আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ হিংসামূলক কার্য করে নাই।' লোম্যান বলিলেন "আমি এইরূপ রিপোর্ট পাইয়াছি যে, তোমরা হিংসামূলক কার্য করার জন্য পরামর্শ করিতেছিলে।" আমি বলিলাম, হিংসামূলক কার্য করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়, যাহার জন্য আবার পরামর্শ করিতে হইবে;—আপনি কি মনে করেন যে, আমরা ইচ্ছা করিলে দু-চার-দশটা ডাকাতি বা খুন করিতে পারিতাম না?" তিনি বলিলেন, তোমার অতীতের যেরূপ ইতিহাস আছে, তাহাতে বিশ্বাস করি, ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারিতে;—পাছে তোমরা দেশে অশান্তির সৃষ্টি কর এজন্য তোমাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। ইহা সাবধানতা-মূলক (precautionary) ব্যবস্থা। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, দেশে যে যুবকদের মধ্যে হিংসামূলক কার্য করার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে তাহা দমন করা যায় কি করিয়া, এবং এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? আমি বলিলাম, ইহা হিংসামূলক কার্য করার প্রবৃত্তি নয়—দেশকে স্বাধীন করার প্রবৃত্তি। আপনারা ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দেন, তবেই ইহার দমন হইতে পারে—শুধু দমননীতি দ্বারা ইহা বন্ধ হইবে না। তিনি বলিলেন, 'আমরা যদি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাই, তবে তোমরা কি দেশ রক্ষা করিতে পারিবে? তোমরা নিজেরা নিজেরা মারামারি, কাটাকাটি করিয়া ধ্বংশ হইবে'। তিনি, ইংরেজগণ ভারতবর্ষের কি কি উপকার করিয়াছেন, ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষ কতটা উন্নত হইয়াছে এবং কি ভাবে আমাদিগকে আস্তে আস্তে উন্নত করিয়া স্বরাজ দেওয়া হইতেছে, ইত্যাদি মামুলি গদ বলিলেন। ইহার কয়েকমাস পর,—সম্ভবতঃ ১৯২৭ সনে ইন্সপেকটর দত্ত কতকগুলি সর্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমরা যদি ঐ সর্তগুলি মানিয়া চলিতে রাজী হই, তবে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে মুক্তি দেওয়ার কথা বিবেচনা করিবেন। আমাকে যখন তিনি ডাকাইলেন, আমি বলিলাম, আমার তিনটি সর্ত আছে—গভর্ণমেণ্ট যদি এই সর্ত তিনটি পালন করিতে রাজী হয়, তবে আমি গভর্ণমেণ্টের সর্তগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিব।

তিনি আমার সর্ত তিনটি জানিতে চাহিলেন। আমি জানাইলাম—(১) আমাকে যে বিনা বিচারে আটক করা হইয়াছে এজন্য গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে (২) আমাকে যে অবৈধভাবে আটক করা হইয়াছে সেজন্য গভর্ণমেণ্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ; এবং (৩) গভর্ণমেণ্টের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে ভবিষ্যতে আমাকে আর বিরক্ত করিতে পারিবে না। ইন্সপেকটর বাবু আমার কথা শুনিয়া খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সম্ভবতঃ উনি ভাবিলেন, আমার মাথা খারাপ হইয়াছে। আমার বক্তব্য লিখিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আমার বক্তব্য আপনি নোট করিয়া যান, নতুবা লোম্যান সাহেবের সাথে আমার যখন দেখা হইবে আমি তখন ইহা বলিয়া দিব। তিনি আমার তিন সর্ত লিখিয়া লইয়া গেলেন। ইহার পর সত্যেনবাবু জেল হইতে মুক্ত হইয়া আমার তিন সর্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯২৮ সনের মধ্যভাগে আমি ইনসিন জেল হইতে কলিকাতা স্থানান্তরিত হই, এবং কলিকাতা হইতে পুলিশ পাহারায় আমাকে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণ করা হয়। তখন বর্ষাকাল ছিল। প্রত্যহ জল কাদা ভাঙ্গিয়া আমার থানায় যাইয়া হাজিরা দিতে হইত। মাসিক ভাতাও ছিল আমার অত্যন্ত কম। কিছুদিন পর আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে আমার অসুবিধা জানাইয়া একখানা দরখাস্ত করি, কিন্তু কোন উত্তর পাই না। ইহার পর গভর্ণমেণ্টকে আর একখানা দরখাস্তে জানাইলাম যে, আমাকে যদি আটক রাখিতে হয় তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে ; নতুবা আমাকে আটক রাখিতে পারিবে না এবং আমিও গভর্ণমেণ্টের আদেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিব না। আমার যদি কষ্ট করিয়াই থাকিতে হয়, তবে আমি অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিব না—অন্যভাবে কষ্ট ভোগ করিব। আপনারা হয়ত আমাকে জেলের ভয় দেখাইবেন, কিন্তু সে ভয় আমার নাই। ইহার কিছুদিন পর ইন্সপেকটর বিশ্বাস আসিলেন আমার সহিত দেখা করিতে। তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেদিন অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। তাঁহাকে জুতা হাতে

করিয়া আমার বাসায় আসিতে হইল। ইহাতেই সম্ভবতঃ তিনি আমার অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি যদি আমাদের ডি, আই, জির নিকট দরখাস্ত করিতেন, তবে তাড়াতাড়ি প্রতিকার হইত। যাহা হউক, আপনি এখন কোন গণ্ডগোল করিবেন না—আমার রিপোর্টের উত্তরের অপেক্ষা করিবেন। তাঁহার রিপোর্টে সুফল ফলিল—আমার ভাগ্য পরিবর্তন হইল। সরকার হইতে উত্তর আসিল, আমাকে আর থানায় হাজিরা দিতে হইবে না এবং মাসিক ৬০৲ টাকা করিয়া ভাতা পাইব। ইহার কিছুদিন পর, ১৯২৮ সনের শেষভাগে কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্বে অন্তরীণ হইতে মুক্ত হইলাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মুক্তির পর

মুক্তির পর হাতিয়া হইতে চট্টগ্রাম যাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন চট্টগ্রামে কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য করার জন্য গিয়াছিলেন। আমি সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। সেনগুপ্ত যে কয়দিন চট্টগ্রামে ছিলেন, আমি সেখানেই ছিলাম। আমরা সেনগুপ্তের সহিত কংগ্রেসের অর্থ সংগ্রহের জন্য বাহির হইতাম। তিনি স্থানীয় বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী, উকিল-মোক্তার, জমিদার প্রভৃতি অনেককেই অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য করিলেন। তিনি ছিলেন খুব অমায়িক। চট্টগ্রামে দেখিলাম তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ;—হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করে। সেনগুপ্তের বাসায় তখন কংগ্রেস কর্মী ও আমরা প্রায় ৩০।৩৫ জন লোক প্রত্যহ নিমন্ত্রণ খাইতাম—খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকিত প্রচুর। চট্টগ্রামে রাজবন্দীদিগকে মানপত্র দেওয়া হইল। সেই সভার সভাপতি ছিলেন সেনগুপ্ত। আমি চট্টগ্রামেই প্রথম মানপত্র পাই। আমরা যে-ভাবে গড়া, তাহাতে সভাসমিতিতে যাওয়া, মানপত্র পাওয়া, শোভাযাত্রা, করতালি, গলায় মালা নেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমরা জানিতাম, আমাদের মিলিবে বন্দুকের গুলি, বেয়নেটের খোঁচা, গলায় ঝুলিবে ফাঁসীর দড়ি ;—আমাদের জন্য কাহারও এক ফোঁটা চোখের জলও পড়িবে না—সকলেই বিপথগামী বলিয়া দিবে গালী। এখন দেখিতেছি অবস্থা অন্য রকম। আমার কেমন লজ্জা বোধ করিতে লাগিল,—মনে হইল, আমরা যেন রাজপুত্রের দল, স্বয়ম্বর সভায় বসিয়া আছি। আমার অবস্থা, নববধূর শুভ পরিণয়ের সময় যেরূপ হয়,—মনে মনে আনন্দ কিন্তু লজ্জায় আনত বদন,—ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। ইহার পর এ-পর্যন্ত নানা স্থানে বহু মানপত্র পাইয়াছি—বহু ফুলের মালা গলায় পরিয়াছি,

আমার জন্য বহু শোভাযাত্রা হইয়াছে—বহু জয়ধ্বনি শুনিয়াছি এবং বহু সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছি। এখন আর আমার সেইরকম লজ্জা হয় না। আমি প্রথম সভাপতি হই ফরিদপুর জিলা যুব সম্মিলনীর নড়িয়া অধিবেশনে। ফরিদপুর জিলা রাজনৈতিক সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন সেনগুপ্ত মহাশয়।

আমি একবার চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নীলা পাহাড়ে মোহিনীর সহিত দেখা করিতে যাই—সেখানে তাহার একটি কৃষি ফার্ম ছিল। নীলা চট্টগ্রাম হইতে ষ্টীমারে যাইতে হয়। আমি পূর্বে মোহিনীকে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে আমার চিঠি পায় নাই। আমি ষ্টেশনে পৌছিয়া জানিতে পারিলাম, মোহিনীর ফার্ম এখান হইতে দশ বার মাইল দূর; নৌকায় যাইতে হইবে এবং পরে মাইল তিনেক হাঁটিয়া যাইতে হইবে। ষ্টেশনে আমার দুইটি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় ঘটে—একটি দারোগাপুত্র ও অপরটি দারোগার ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহাদের একটি কৃষিকার্য ছিল। উহা মোহিনীর ফার্ম হইতে দুই মাইল দূর। তাহারা আমাকে তাহাদের নৌকায় সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহাদের সহিত আমার রাস্তায় আলাপ পরিচয় বিশেষ কিছু হয় নাই। দ্বিপ্রহরে আমাদের নৌকা তাহাদের বাসার কাছে পৌছিল। আমি তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর বৈকালে আমি মোহিনীর বাসার উদ্দেশ্যে চলিলাম, তাহারাও ভদ্রতা করিয়া রাস্তা দেখাইয়া দেওয়ার জন্য সঙ্গে চলিল। আমরা ফরেষ্ট অফিসের পাশ দিয়া যাইতে ছিলাম। ফরেষ্টার বাবু আমাদিগকে যাইতে দেখিয়া দারোগার পুত্রকে ডাক দিলেন। আমরা ফরেষ্ট আফিসে যাইয়া বসিলাম। আমি মোহিনীর সাথে দেখা করিতে যাইতেছি শুনিয়া ফরেষ্টার বাবু বলিলেন, 'মোহিনীবাবু একসময় স্বদেশী দলে ছিলেন—বহুবৎসর জেলে কাটাইয়াছেন, কিন্তু এখন ওসব ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং বেশ অর্থ উপার্জন করিতেছেন। আমার দাদা একজন স্বদেশী দলের পাণ্ডা ছিলেন। তিনিও বহুবৎসর জেলে কাটাইয়াছেন, কিন্তু এখন আর স্বদেশীর নাম করেন না। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী নামে একজন খুব বড় স্বদেশী ছিল, আমি তাহাকে দাদার সহিত দেখিয়াছি। তখন আমার বয়স অল্প ছিল—

সে আমাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখিত। তাহারও এখন দাদার অবস্থা হইয়াছে; সবই এখন ঘর লইয়াছে'—দারোগাপুত্রও বলিল, তাহার বাবা যে থানায় ছিলেন, সেই থানায় অনেক রাজবন্দী ছিল—এখন সকলেই ঘর লইয়াছে। আমি চুপ করিয়াছিলাম। তাহারা আলোচনায় ঠিক করিল, বাঙ্গালীর হুজুগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ফরেষ্টার বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সাথে ত পরিচয় হইল না,—আপনার বাড়ী কোথায়? আমি বলিলাম, ময়মনসিংহ জেলায়। তাঁহার মনে তখন সন্দেহ হইয়াছে—একটু আশ্চর্যান্বিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম?—আমার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়, আনন্দ, বিস্ময়, লজ্জায় অভিভূত। আমার সেইদিন আর মোহিনীর ফার্মে যাওয়া হইল না—পরদিন বৈকালে সেখানে গেলাম।

মোহিনীর সহিত ১৫ বৎসর পর দেখা। সে আমাকে প্রথমতঃ চিনিতে পারে নাই। তাহার ওখানে আমি দুই তিন দিন ছিলাম। মোহিনীর বাসা একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর। সেই জায়গার জলবায়ু বেশ ভাল এবং খাদ্যদ্রব্য বেশ সস্তা। আমার বহুদিনের একটা ইচ্ছা ছিল যে, কোন একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা হাঁসপাতালের ব্যবস্থা করা। বহু রাজনৈতিক কর্মী সুদীর্ঘকাল কারাবাসের পর ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বাহিরে আসে—তাহাদের দাঁড়াইবার কোন স্থান থাকে না। জেলের বাহিরেও অনেক কর্মীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়—তাহাদেরও বিশ্রামের কোন স্থান নাই। যদি একটা হাঁসপাতালের মত থাকে, তবে তাহারা কিছুদিন সেখানে থাকিয়া সুস্থ হইয়া পুনরায় দেশের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। আমি মোহিনীকে আমার সঙ্কল্পের কথা জানাইলাম। সে তাহার ফার্মের কতকটা অংশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইল এবং বলিল, সে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া দিবে। এখন বাকি ব্যবস্থার জন্য অর্থের প্রয়োজন,—অর্থ পাই কোথায়? কিছুদিন পর আমি কুমিল্লা যাই। সেখানে 'লেবার হাউসে' থাকি।

আমি লেবার হাউসের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া কুমিল্লার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী দাতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহিত দেখা করি। তিনি আমার প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, বহুলোক তাঁহার নিকট হইতে টাকা নেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহ টাকার হিসাব দেয় না। তিনি প্রথমতঃ সাহায্য করিতে রাজী হইলেন না—পরে এক বৎসর পর দেখা করিতে বলিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, সম্ভবতঃ আমার আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য এরূপ বলিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এক বৎসর পর কখন দেখা করিব? তিনি বলিলেন, এই মাসের, এই তারিখ, এই সময়, এইখানেই দেখা করিবেন। তখন সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল। কিন্তু পরবর্তী জ্যৈষ্ঠের পূর্বেই আমি ধৃত হই, এবং তার পর একে একে বহু জ্যৈষ্ঠ অতীত হইয়াছে। আমি বহুকাল কারাগৃহে আবদ্ধ —আমার সঙ্কল্প আর কাজে পরিণত হয় নাই।

১৯২৪ সনের নভেম্বর মাসে ধরা পড়িয়া চারবৎসর জেল বাসের পর আবার ১৯২৮ সনে মুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া আমার লিখিত গীতা-ভাষ্যের খাতাখানা পাইয়াছিলাম এবং এইদিকে পুনরায় মন দিয়াছিলাম।

১৯২৮ সনে মুক্ত হওয়ার পর গীতার প্রথম খণ্ড আমি চারি অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রবাসী, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। গীতা ছাপাইয়া আমি আর্থিক লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই,—ছাপার খরচ আমার উঠিয়া গিয়াছিল। অল্পদিন পর ১৯৩০ সালে পুনরায় ধৃত হই এবং দীর্ঘ নয় বৎসর পর জেল হইতে ফিরিয়া বাকি বইগুলির কোন খোঁজ পাই নাই। ১৯৩০ সনে ধৃত হওয়ার পর আমি গীতার বাকি অধ্যায়গুলি ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। ১৯৩৮ সনের শেষভাগে জেল হইতে মুক্ত হইয়া দেশের যেরূপ অবস্থা দেখিলাম তাহাতে গীতা প্রকাশ করার ভরসা হইল না। তখন মনে হইল এত বড় বই বেশী বিক্রয় হইবে না—আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হইব;—বিশেষতঃ বই ছাপাইবার টাকাও আমার ছিলনা।

১৯২৯ সনে আমি একদিন সুভাষবাবুকে বলিয়াছিলাম, আমার আলীপুর জেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য লিখিত খাতাগুলি পাইয়াছি—এখন যদি

সেগুলি কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলে পাঠ্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে আমার কিছু আর্থিক সুবিধা হয়। বাড়ী ছাড়ার পর হইতে, আমার খরচ চিরকালই আমার বন্ধুবান্ধবরা চালাইয়া আসিয়াছেন। বাড়ীর সঙ্গে আমার বিশেষ কোন সংশ্রব ছিল না। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটা মেস ছিল। শ্রীমান কেদারেশ্বর সেন সেখানে একটা সম্পূর্ণ কোঠা ভাড়া করিয়া থাকিত। আমি তখন কেদারের নিকটই থাকিতাম—আমার খাওয়া খরচ কেদারই চালাইত। আমার প্রস্তাব শুনিয়া সুভাষবাবু এডুকেশন অফিসারের নিকট একখানা ভাল সুপারিশ পত্র লিখিয়া দিয়া আমাকে তাঁহার বাসায় যাইয়া দেখা করিতে বলিলেন। আমি পরদিন সুভাষবাবুর চিঠি ও খাতাগুলি লইয়া এডুকেশন অফিসারের তখনকার বাসায় যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি খাতাগুলি দেখিতে চাহিলেন। আমি খাতাগুলি তাঁহাকে দিলাম। তিনি আর একদিন আসিয়া দেখা করিতে বলিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পর আমি প্রায়ই তাঁহার বাসায় যাই, দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর তিনি নীচে নামিয়া আসেন এবং আর একদিন আসিতে বলেন। একদিন তিনি বলিলেন, এক লেখকের এতগুলি বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিতে পারিব না, আমাদের কমিটি রাজী হইবে না এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ হৈ চৈ করিবে, আমি দুই-একখানা বই পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করিয়া দিব। আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি দুই একখানা বইয়ের দুই এক জায়গায় কিছু পরিবর্তন করিয়া দিতে বলিলেন, আমি তাহাই করিয়া দিলাম। ইহার পরও আমি তাহার বাসায় যাই এবং বহুক্ষণ অপেক্ষার পর ফিরিয়া আসি ও মনে মনে চটি। আমি জানিতাম, গ্রন্থকারদের বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিতে বহু বেগ পাইতে হয়,—বহু মাল মশল্লা খরচ করিতে হয়,—তৈল মর্দনও করিতে হয় বহু, এবং কয়েক জোড়া জুতার তলীও বদলাইতে হয়। কিন্তু আমার ধাত অন্য রকমের, দীর্ঘকাল ইহা পোষাইল না। আমার মনে হইল, দাস মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আমার কোন বেগ পাইতে হয় নাই, সেনগুপ্ত, সুভাষবাবুর সহিত দেখা

করিতে এতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয় না, আর একজন এডুকেশন অফিসারের সহিত দেখা করার জন্য এতক্ষণ বসিয়া থাকা অত্যন্ত অসহ্য ও অপমানকর। একদিন প্রাতে সাতটা হইতে দশটা পর্যন্ত বসিয়া আছি, তিনি উপর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার অফিসে যাইয়া দেখা করিতে। আমি পূর্বেই সংবাদ লইয়াছিলাম, যে, তিনি কোন কাজ করিতেছিলেন না। আমি তাঁহার উপর চটিয়া গেলাম, এবং একটুকরা কাগজে শুধু ইহা লিখিয়া পাঠাইলাম "আমি বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে পায়ে হাঁটিয়া এতদূর রাস্তা আসিতে পারিলাম, আর আপনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতে পারিলেন না, তিন ঘণ্টা আমাকে বসাইয়া রাখিলেন? ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।"—তিনি আমার উপর ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং বীরদর্পে নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "কিছু হবে টবেনা, ও কিছু হয় নাই, আপনি চলে যান।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার খাতা ফেরৎ পাইব কি?" তিনি বলিলেন "আমার আফিস হইতে নেওয়াইয়া লইবেন।" আমি কর্পোরেশনের একজন শিক্ষককে পাঠাইয়া আমার খাতাগুলি ফেরৎ আনাইলাম। আফিসে ধমক খাইলে কেরাণীবাবুদের যেমন গিন্নীর উপর রাগ হয়, আমারও তেমনি রাগ হইল এই খাতাগুলির উপর। আমি এই খাতাগুলি নষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, এখন আর কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে না। ইহার কিছুদিন পর, সুভাষবাবুকে এই ঘটনা জানাইয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

১৯২৯ সনে আমি পুলিশকে ফাঁকি দিয়া ব্রহ্মদেশে যাই এবং সেখানে প্রায় তিন মাস থাকি। সেনগুপ্ত যখন রেঙ্গুনে গিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত দেখা করি ও আমার বন্ধুদের তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেই। পুলিশ চারিদিকে আমার অনুসন্ধান করিতেছিল—ব্রহ্মদেশের পুলিশের নিকটও সংবাদ গিয়াছিল, আমি সেখানে আছি কিনা অনুসন্ধান করার জন্য। ওখানকার পুলিশ পাঁচ সাত দিন এদিক ওদিক খবর লইয়া রিপোর্ট দিল, আমি ওখানে নাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্তী তখন

রেঙ্গুনে ছিলেন—তিনি আমার কোন সংবাদ জানিতেন না,—আমিও তাঁহার সহিত দেখা করি নাই। পুলিশ তাঁহার নিকট যাইয়া আমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সে রেঙ্গুনে আসিলে ত আমার বাসায়ই উঠিবে—সে ত আসে নাই।—পূর্বে ব্রহ্মদেশে আসিয়াছি সরকারের অনুগ্রহে এখন আসিয়াছি স্বাধীন ভাবে। আমি কিছুদিন রেঙ্গুনে থাকিয়া পরে ওখান হইতে ষ্টীমারে মান্দালয় যাই। মান্দালয় ষ্টীমারে যাইতে এক সপ্তাহ লাগে, আমি মান্দালয় যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে কোন কোন ষ্টেশনে নামিয়া সেই সহরে দুই চারিদিন করিয়া কাটাইয়াছি। ইরাবতী নদীর দুই ধারে মাঝে মাঝে পাহাড়; সুন্দর সুন্দর সহর, কত সুন্দর সুন্দর মন্দির—প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। জেলে আমি সামান্য কিছু ব্রহ্মভাষা শিখিয়াছিলাম, এখন নির্ভয়ে এবং বেপরোয়াভাবে তাহাই চালাইতে লাগিলাম। আমি পূর্বে মান্দালয় জেলে ছিলাম—এখন কয়েকদিন যাবত মান্দালয় সহরে আছি। ব্রহ্মদেশীয় রাজনৈতিক ভাবাপন্ন লোকদের সহিতও আলাপ করি। অবশ্যই তাহাদের সাথে আলাপ করার সময় দো-ভাষী থাকে, কারণ অনেকেই ইংরেজী বা হিন্দী জানেন না, আমারও তাদের ভাষায় আলোচনা করার মত বিদ্যা ছিল না। একদিন মান্দালয় ফোর্ট ও রাজা থিবোর প্রাসাদ দেখিয়া আসিলাম। দূর হইতে জেলও দেখিলাম কিন্তু নিকটে যাই নাই। একদিন আমার পরিচিত কয়েকজন বাঙ্গালী মেই-মো বেড়াইতে যাইবে। মেই-মো ব্রহ্মদেশের দার্জিলিং; অনেকে বলে দার্জিলিং হইতেও সুন্দর। ইহা মান্দালয় হইতে ৪০ মাইল দূর, ভাড়া একটাকা চারি আনা। তাহারা আমাকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল। সেখানে আমার পরিচিত লোকজন কেহ ছিল না এবং আমার কোন কাজও ছিলনা, তাই আমি তাহাদিগকে বলিলাম, ছবিতে মেই-মোর অনেক দৃশ্য দেখিয়াছি, এখন পয়সা খরচ করিয়া সেখানে যাইয়া নূতন কি দেখিব? তাহারা বলিল, 'আপনার পয়সা খরচ হইবে না।' আমি বলিলাম 'তোমাদের পয়সাই বা বৃথা খরচ করাইব কেন?

মান্দালয় হইতে রেঙ্গুন আমি ট্রেনে যাইব ঠিক করিলাম। পূর্বে আমি

প্রহরী বেষ্টিত হইয়া এই লাইনে যাতায়াত করিয়াছি। রেল লাইনের দুই ধারে মাঝে মাঝে পাহাড় এবং পাহাড়ের চূড়ায় সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে, দৃশ্য খুবই মনোরম। ট্রেনে রওয়ানা হইয়া আমি মাঝে মাঝে দুই চারি জায়গায় নামিয়া বন্ধুদের সহিত দেখা করিলাম। অবশেষে টাঙ্গু সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। টাঙ্গু ষ্টেশন বেশ বড়, সহরও ছোট নয়। টাঙ্গুতে আসিয়া এক মেসে উঠি। একদিন প্রাতে প্রায় দশটার সময় টাঙ্গু রেল ষ্টেসনে একজন রেল কর্মচারীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। আমার সহিত একজন স্থানীয় ভদ্রলোক ছিলেন। ষ্টেসনে যাওয়ার পর একজন বাঙ্গালী আই, বি, সাব-ইন্সপেক্টর আমাকে নমস্কার জানাইয়া "কি ত্রৈলোক্য বাবু, কেমন আছেন" বলিয়া প্রশ্ন করিলেন। আমি ইনসিন জেল হইতে যখন কলিকাতা চালান যাই তখন তিনি আমাকে রেঙ্গুন ষ্টেশনে দেখিয়া চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম 'ভাল আছি'। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমি কবে, কেন এবং কোথা হইতে এখানে আসিয়াছি,—ও এখানে আসার উদ্দেশ্য কি ? আমি বলিলাম, 'গতকল্য রেঙ্গুন হইতে এখানে আসিয়াছি, —এখানে আমার পরিচিত কেহ নাই—বর্তমানে একটা হোটেলে উঠিয়াছি, এখানে কোন ব্যবসার সুবিধা হয় কিনা, সেই চেষ্টায় আছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি কোন প্রকার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন কিনা ? তিনি বলিলেন, তিনি নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি বলিলাম, তবে আজ দ্বিপ্রহরে আপনার বাসায় যাইব। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমি দ্বিপ্রহরে, খাওয়ার পরই চম্পট দিলাম এবং রাত্রে পেগু সহরে নিশ্চিন্ত মনে এক বন্ধুর বাসায় কাটাইলাম। আমি পেগুতে ৩।৪ দিন থাকিয়া রেঙ্গুন যাই এবং কিছুদিন পর সেখান হইতে চট্টগ্রামে পৌছি। এখানে কয়েকদিন থাকার পর ১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ফিরিয়া আসি এবং পুলিশ আমার অনুসন্ধান করিতে থাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জেলে পঞ্চমবার

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে রাজসাহীতে একটি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার্স কনফারেন্স হয়। আমি উহার সভাপতি নির্বাচিত হই। আমি যে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম তাহা কিন্তু আমি জানিতাম না। আমি মফঃস্বলে ছিলাম—আমার অভিভাষণ লেখা হয় নাই। কনফারেন্সের কর্মকর্তারা কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া ও চিঠি লিখিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কেদার ও রবিবাবু আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও আমি পাই নাই, কারণ আমি কোন নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম না। আমি রাজসাহী কনফারেন্সে যাইব, ইহা পূর্ব হইতেই স্থির ছিল। কনফারেন্সের পূর্বদিন আমি রাজসাহী ষ্টেসনে পৌঁছি। সেখানে পৌঁছিয়া প্রথম সংবাদ পাই যে আমি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি, আমার জন্য ফুলের মালা ও মোটর লইয়া অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তারা হাজির। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। আমার অভিভাষণ লেখা হয় নাই—বক্তব্য মুখে বলিতে হইবে;—অথচ আমি বক্তৃতা দিতে জানি না। লেখার একটা সুবিধা আছে, নিজে না পারি, অপর কেহ লিখিয়া দিতে পারে। তাহা নিজ নামে চালাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু মুখে বলিতে হইলেই ত বিপদ। আমার ভয় হইতে লাগিল। প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স, কত জায়গা হইতে কত লোক আসিয়াছে, এখন আমি তাহাদের কাছে কি বলিব? প্রথমতঃ আমি রাজি হইলাম না,—তাহারাও আমাকে রেহাই দিবে না, অগত্যা বাধ্য হইয়া রাজি হইলাম। সেইদিন রাত্রি দুইটা পর্যন্ত অনেকের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া শুইতে গেলাম। গরমের জন্য ভাল ঘুম হইল না, বক্তৃতার চিন্তাও মন হইতে দূর করিতে পারিলাম

না। শেষরাত্রে সংবাদ পাইলাম, পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। প্রাতে আমাকে গ্রেপ্তার করিল। আমাকে যখন গ্রেপ্তার করিল, সর্বপ্রথম আমার ইহাই মনে হইল, যে, বক্তৃতা দেওয়া হইতে রক্ষা পাইলাম। সকলেই ভাবিল কনফারেন্সের কাজ পণ্ড করার জন্য চারিজন সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সদর হাকিমের বাংলায় লইয়া যাওয়া হইল—সেখানে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। এমন সময় কলিকাতা হইতে ডাঃ দাশগুপ্ত আসিয়া সংবাদ দিলেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছে—কলিকাতায় বহুবাড়ী খানা তল্লাসী হইয়াছে ও বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমরা রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে চলিলাম। আমাদের সাথে বিরাট শোভাযাত্রা—পুলিশ বাহিনীও সঙ্গে আছে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ স্বয়ং আমাদের সাথে আস্তে আস্তে মোটর চালাইয়া যাইতেছেন। এমন সময় দুইটি মেয়ে ভিড় ঠেলিয়া, জাতীয় পতাকা হস্তে আমাদের দুই পাশে আসিয়া বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, ইহারা দুইজনই আমাদের মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকাদের ক্যাপ্টেন। কিছুদিন পর জিতেশ (লাহিড়ী) যখন ডেটিনিউ হইয়া জেলে আসিল, তখন সে বলিল, "আপনাদের গ্রেপ্তার হওয়ার পর মীরা ও হেনা ভুলিয়া গিয়াছিল যে তাহারা মেয়ে—আমি দেখিলাম, তাহারা দুইহাতে ভিড় ঠেলিয়া আপনাদের দিকে যাইতেছে।"

জেলে আমাদিগকে একা একা বেশীদিন এই অবস্থায় থাকিতে হয় নাই। আবার দেশপ্রেমের বন্যা আসিল, সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স বা আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হইল। এবার বন্যার বেগ অন্যান্য বারের অপেক্ষা অনেক প্রবল। জেল ভর্তি হইতে আরম্ভ করিল। একদল লোক আইন অমান্য করিয়া জেলে আসিল ও সরকার অপর আর এক দলকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিতে লাগিলেন। এইবার বাঙ্গালাদেশে প্রায় চারি হাজার লোক বিনা বিচারে আটক রহিল—বৈপ্লবিক মামলায় প্রায় এক হাজার লোক দণ্ডিত হইল এবং আইন অমান্য করিয়া বাঙ্গালা দেশের প্রায় পনর ষোল হাজার লোক জেলে

গেল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট পঁচিশ হাজার লোক জেলে গিয়াছিল, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষ হইতে একলক্ষ লোকের অধিক জেলে গেল। আরও কয়েক লক্ষ লোক যাইতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সরকার তাহাদিগকে না ধরিয়া শুধু প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিত। দেশ ক্রমে ক্রমে যে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর "আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র" মামলা সুরু হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলায় সরকার পক্ষ লাহোর, মান্দালয়, মদ্রপ্রদেশ ও আরো অন্যান্য বহু স্থান হইতে বহু লোক আনাইয়া সাক্ষী দেওয়াইয়াছিল। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট কর্মীরা এই ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী ছিল। আমরা তখন জেলে তিন আইনে আটক ছিলাম। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বহুলোক ধৃত হইয়াছিল এবং এই মামলা বহুদিন চলিয়াছিল। এদিকে মামলা যখন চলিতেছে, সমিতির সকল প্রধান কর্মীরাই যখন জেলে আবদ্ধ, তখন কয়েকটি অল্পবয়স্ক যুবক সমিতির নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া বিপ্লবের আয়োজন করিতে লাগিল। এই সময় অমূল্য মুখার্জীর ছোট বোনকে বৈপ্লবিক কাজের সহায়তার জন্য বাড়ী হইতে আনা হইল। অমূল্য তখন ক্যাম্পে আটক ছিল। এদিকে পূর্ণানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন বিচারাধীন আসামী আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। ইহার পর পূর্ণানন্দ টিটাগড়ে ধৃত হয় এবং "টিটাগড় ষড়যন্ত্র" মামলা সুরু হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলায়ও বহুলোক ধৃত হয়। এই উভয় মামলায় "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র" এই অভিযোগে পূর্ণানন্দ, সীতানাথ প্রভৃতি বহুলোক দণ্ডিত হয়। এই সময় দমননীতি খুব জোরে চলিতে থাকে। সকল দলের লোকই কর্মঠ হইয়া উঠিল, পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা পড়িল—অল্পের জন্য তিনি বাঁচিয়া গেলেন। পুলিশের আই, জি লোম্যান সাহেব ঢাকাতে পিস্তলের গুলিতে হত হইলেন,—জেলের আই, জি

সিমসন গুলিতে নিহত হইলেন। মেদিনীপুরে তিন জন ইউরোপীয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট একে একে নিহত হইলেন। আরো অনেক শেতাঙ্গ সরকারী কর্মচারী এবং কয়েকজন দেশীয় পুলিশ কর্মচারী ও গোয়েন্দা হত হইল। বাঙ্গালা দেশে সৈন্য আমদানী হইল, ঢাকা ও চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইয়া গেল। বাংলাদেশ তখন প্রায় মার্শাললর অধীনে ছিল। চারিদিকে খানা তল্লাসী, ধরপাকড়, সকলের মনেই উদ্বেগ ও আতঙ্কের ভাব সঞ্চারিত হইল। যে সকল যুবক তখন জেলের বাহিরে ছিল, তাহাদিগকে বিভিন্ন রংএর 'আইডেনটিটি' টিকেট দেওয়া হইল। তাহাদের অবস্থা ছিল দাগী চোরের মত। এই সময় বাঙ্গালার মেয়েরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব অগ্রসর হইল। মেয়েরা দলে দলে আইন অমান্য, প্রশেসন, মিটিং ও পিকেটিং করিতে লাগিল। তাহারা পুলিশের লাঠি চার্জের সম্মুখীন হইতে একটুও দ্বিধা বোধ করিল না। দলে দলে জেলে যাইয়া জেল ভর্তি করিল। বীণা দাস বাঙ্গালার গভর্ণর জ্যাকসন সাহেবকে গুলি করিল, উজ্জলা মজুমদার বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনকে গুলি করার সময় সাহায্য করিল, কুমিল্লাতে শান্তি ও স্থনীতি শেতাঙ্গ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলি করিয়া হত্যা করিল—প্রীতিলতা চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে হত হইল, কল্পনা "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের" মামলায় এবং পারুল "টিটাগড় ষড়যন্ত্র" মামলায় দণ্ডিত হইল। এতদ্ব্যতীত বহু মেয়ে বিনা বিচারে জেলে আটক রহিল। বহু মেয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে অন্তরীণাবদ্ধ হইল। আমাদের মেয়েরা এতদিন অন্তঃপুরে আবদ্ধ ছিল, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে নবজাগরণ আসিল। এখন তাহারা শিখিল স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে—আর তাহারা অন্তঃপুরে শুধু অবদ্ধ থাকিতে চায় না—ছুটিয়া চলিতে চায় এখন স্বাধীনতা লাভের জন্য। যখন তাহারা দেখিল তাহাদের ভাইয়েরা দেশের স্বাধীনতার জন্য নির্যাতন ভোগ করিতেছে, তাহারাও তখন তাহার অংশ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

গভর্ণমেণ্ট দমননীতি অবলম্বন পূর্বক অসহযোগ আন্দোলন দমন

করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারেন নাই—ইহা এখন বিরাট "আইন অমান্য আন্দোলন"-রূপে দেখা দিল্। এই আন্দোলনে সরকার পক্ষ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছে এবং দেশের যুবকেরাও তাহার প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। এই আন্দোলনও সরকার "দমননীতি" অবলম্বন পূর্বক দমন করিয়া দিলেন। দমননীতি জেলের ভিতরও চলিল—বিভিন্ন জেলে লাঠি চার্জ্জ হইল। এই আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তিন আইনে জেলে আটক হন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষাধিক লোক দণ্ডিত হন। ইউরোপের 'রাজনীতি' তখন বৃটিশের অনুকূলে ছিল না। তাই বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবাসীদের সহিত একটা রফা করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতি বিশারদগণ সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রতিনিধিগণ গোলটেবিলে এক সঙ্গে বসিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইল না। জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিল। তখন ইংরেজের কূটনীতি চলিতে লাগিল, বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হইল—অনেক ভুঁইফোড় নেতার আবির্ভাব হইল,—বাক বিতণ্ডা হইল অনেক,—কোন সমস্যারই সমাধান হইল না—প্রতিনিধিরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মদেশকে এই সময় ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ভারতবাসীকে কিছু না দিলে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাই হাতে অনেক রক্ষা কবচ রাখিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন দিলেন—কিন্তু দেশবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না।

রাজসাহী জেলের জেলার ছিলেন সুরেন গুপ্ত। তিনি খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি যতদিন সেখানে ছিলেন, ততদিন রাজসাহী জেলে কোন গণ্ডগোল হয় নাই। জেলে যখন বহুলোকের আমদানী হইল, তখন "মেয়ে

ইয়ার্ড” খালি করিয়া সেখানে আইন অমান্যকারীদিগকে থাকিতে দিল এবং মেয়েদিগকে অন্য একটা ছোট ইয়ার্ডে স্থানান্তরিত করিল। ইতিমধ্যে একদিন কতিপয় ইরাণী মেয়ে গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসিল। জেলার বাবু তখন আইন অমান্যকারীদিগকে মেয়ে ইয়ার্ড ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহারা রাজী হইল না। জেলার বাবু বলিলেন, আমি আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিলাম, অবশ্যই আপনারা শেষ পর্যন্ত এই স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন।—তাহারা বলিল, আপনার যত সিপাহী আছে সকলকে লইয়া আসিবেন। জেলার বাবু বলিলেন, আমি এমন সিপাহী পাঠাইব যে তাহাদিগকে দেখিয়া আপনারা ভয়ে পলাইয়া যাইবেন। সকলেই মনে করিল আজ লাঠি চার্জ হইবে। বৈকাল পাঁচটার সময় দেখা গেল একজন জমাদার ২৫।৩০ জন ইরাণী মেয়েকে “মেয়ে ইয়ার্ডের” মধ্যে জোড়া জোড়া করিয়া বসাইয়া গেল,—তাহাদের সাথে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও নিজেদের জিনিষপত্র কিছু কিছু ছিল। তখন আইন অমান্যকারীরা মহা ফ্যাসাদে পড়িল, এবং “জেলার বেটা বড় চালাকী করিল” বলিতে বলিতে নিজ নিজ বিছানা পত্র সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল। পনের মিনিটের মধ্যে “মেয়ে ইয়ার্ড” খালি হইয়া গেল—ইরাণী মেয়েরা তাহা দখল করিয়া লইল।

আমি এবং প্রতুলবাবু রাজসাহী জেল হইতে বহরমপুর জেলে চালান গেলাম। আমাদিগকে মোটরে নাটোর ষ্টেশনে আনা হইল। ষ্টেশনে আমরা আমাদের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম, আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইব, অন্য গাড়ীতে উঠিব না—আমরা সত্যাগ্রহ করিলাম। পুলিশ কর্মচারী বলিলেন, তিনি ইণ্টার ক্লাসের ভাড়া পাইয়াছেন, এখন কি করিয়া আমাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে লইয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে ট্রেন আসিল। এই গাড়ীতে রংপুর জেল হইতে একদল আইন অমান্যকারী বন্দী খুব হৈ চৈ করিয়া দমদম ক্যাম্প জেলে যাইতেছে। পুলিশ কর্মচারী আমাদিগকে এই সংবাদ দিলেন। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতেছিল।

আমরা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা ভুলিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের সাথে মিলিত হইলাম,—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পরদিন আমরা বহরমপুর জেলে পৌঁছিলাম। বহরমপুর জেলে কিছুদিন পূর্বে আইন অমান্যকারীদের উপর লাঠি চার্জ হইয়া গিয়াছে। আমাদের রাজসাহী জেল ত্যাগের পর জেলার স্বরেন গুপ্ত অন্যত্র বদলি হইয়া যান। নূতন জেলারের ব্যবহারে রাজসাহী জেলে গণ্ডগোল হইতে লাগিল। ফলে সেখানেও লাঠি চার্জ হয় এবং জেলার আইন অমান্যকারীদের হাতে মার খান। বহরমপুর জেলে কেদার ডেটিনিউ অবস্থায় ছিল। কিছুদিন পূর্বে মাত্র সে অনশন ভঙ্গ করিয়াছে—তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমি এবং প্রতুলবাবু কয়েক মাস বহরমপুর জেলে থাকার পর "বক্সা" ক্যাম্প জেলে স্থানান্তরিত হই। "বক্সা ক্যাম্প" পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহা একটি পুরাতন ফোর্ট। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোহর—অবশ্য খাওয়ার বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ঐখানে আমাদের সংখ্যা প্রায় দেড়শতের উপর ছিল। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল বিপ্লবীদলের নেতা এবং প্রধান কর্মীরা এখানে ছিলেন।

১৯৩১ সনে হিজলী ক্যাম্প জেলে ডেটিনিউদের উপর গুলি চলে, ফলে কয়েকজন ডেটিনিউ হত ও আহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বক্সা ক্যাম্পের সকল ডেটিনিউ অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। আমাদের যুবকদের জীবনীশক্তি যে কত কমিয়া গিয়াছে, এই অনশনের সময় তাহা দেখিতে পাইলাম। আমরা যাহারা বয়স্ক ছিলাম, সপ্তম দিনেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের সংবাদ লইয়াছি—কিন্তু যুবকের দল সকলেই প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। এই বক্সাতে দশ বৎসর পর আমার আবার হাঁপানী দেখা দিল। প্রায় তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলাম,—'সোয়ামীন ইনজেকসনে' আবার সারিয়া উঠিলাম, এখানে আমি গীতার বাকি অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা লিখি। ১৯৩১ সনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত গোল টেবিল বৈঠকের সমসময়ে তাঁহার বিলাতে যাওয়ার পূর্বে, এখানে আসিয়া আমাদের সাথে দেখা করিয়া যান। তিনি সকল দলের নেতৃস্থানীয় লোকের সহিতই আলাপ আলোচনা

করেন। এই সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে, বিপ্লবীদের সহিত গভর্ণমেণ্টের কোন প্রকার আপোষ হইতে পারে কিনা। তিনি এই সম্বন্ধে বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত দেখা করিয়া আলাপ করিয়াছিলেন এবং এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের কয়েকজন প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে আলাপ আলোচনা করিবে। সেনগুপ্ত চলিয়া যাওয়ার পর দুই একখানা চিঠির আদান প্রদান হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মাদ্রাজের বিভিন্ন জেলে

১৯৩১ সনের শেষভাগে আমাদিগকে তিন আইনের বন্দী করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলে পাঠান হইল। আমি এবং প্রতুলবাবু ভেলোর জেলে, রমেশবাবু ও রবিবাবু কেনান্নুর জেলে স্থানান্তরিত হইলেন। মালাবার বিদ্রোহের নেতা নারায়ণ মেনন ভেলোর জেলে আমাদের সঙ্গে একত্র ছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে মালাবার বিদ্রোহের অনেক ঘটনা জানিতে পারিলাম। মেনন খুব অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ভেলোর জেলে আমরা কয়েক মাস ছিলাম। ইহার কিছুদিন পর প্রতুল বাবুকে ত্রিচিনপলি জেলে এবং আমাকে কেনান্নুর জেলে পাঠান হইল। কেনান্নুর যাওয়ার সময় ট্রেন হইতে মালাবারের বেশ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। কেনান্নুর জেল তখন আইন অমান্যকারী বন্দীদের দ্বারা ভর্তি ছিল। সেখানে কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কর্ণাটক নেতা সদাশিব রাও এবং মালাবার নেতা রামন মেননের সহিত আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়। কেনান্নুর জেলে আইন অমান্যকারীদিগের উপর দুইবার লাঠি চার্জ হয়। দ্বিতীয় বার লাঠি চার্জের পরও বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের উপর নির্যাতন চলে। একবার আইন অমান্যকারীদিগকে ঘরের ভিতরে বন্ধ করিয়া তাহাদের সম্মুখে তিনজন নেতৃস্থানীয় লোককে বেত মারা হয়। সেই সময় আইন অমান্যকারিগণ খুব সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল,—কোন প্রকার শাস্তির ভয়ে পিছপাও হইল না। আমাদের উপরও কর্তৃপক্ষ অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে চিকিৎসার জন্য রমেশবাবু ও রবিবাবু মাদ্রাজ জেলে গেলেন,—আমি ওখানে একা রহিলাম। জেল কর্তৃপক্ষ

নির্বুদ্ধিতা বশতঃ আমাকে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা দেওয়া বন্ধ করিলেন, যদিও ইহা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ছিল। এখন আমার সুযোগ ঘটিল—সঞ্জীবনী পত্রিকা বন্ধ করার জন্য এবং জেলখানায় আইন অমান্যকারীদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার হইতেছে তাহা উল্লেখ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানা দরখাস্ত করিলাম। পরদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে অফিসে ডাকাইয়া বসিতে চেয়ার দিলেন না। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া আমার দরখাস্তের জন্য তিরস্কার করিলেন—আমিও পাল্টা তাহাকে ধমক দিলাম। আমি তিন আইনের বন্দী, আমাকে তিনি অফিসে বসার জন্য চেয়ার দিতে বাধ্য, এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর, তিনি বলিলেন, এখন তুমি বসিতে পার। আমি বসিলাম না—চলিয়া আসিলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা। আমি আমার ইয়ার্ডে আসিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানা দরখাস্ত করিয়া জানাইলাম যে, আমি সঞ্জীবনী পত্রিকার জন্য এবং জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ অনশন ব্রত গ্রহণ করিলাম। ইহাতে জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরদিন একটু নরম হইলেন। তাঁহারা আমার নিকট পুনঃ পুনঃ আসিয়া সঞ্জীবনী গ্রহণ করিতে এবং আমার দরখাস্ত ফেরৎ নিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি দমিলাম না। এতদিন ধরিয়া কংগ্রেসকর্মীদের উপর যে সব অত্যাচার হইয়াছে, আমি তাহা ভুলি নাই। আমি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলাম না—আমার অনশন চলিতে লাগিল।

একদিন জেলের বে-সরকারী পরিদর্শক (নন-অফিসিয়াল ভিজিটার) রাও সাহেব আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমি তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া আমাকে জানাইলেন যে, আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস ঘরে ছাতা মেলিয়া প্রবেশ করিয়াছি—ইহা ভদ্রতা বিরুদ্ধ। তখন বুঝিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজের দোষ ঢাকার জন্য একটা মিথ্যা মামলা সৃষ্টি করিয়াছে। আমি বলিলাম "আমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে, যে, আমি অফিস ঘরে ছাতা মেলিয়া প্রবেশ করিব ?—কেহ পাগল না হইলে ছাতা

মেলিয়া দোতলার উপর উঠেনা। ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছি।" ইহার পর আসিলেন জজ সাহেব,—তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও আসিলেন। সকলকেই আমার বক্তব্য বলিলাম। কিন্তু অফিস হইতে গোপনে সংবাদ পাইলাম যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কোন দোষ নাই—আমিই দোষী। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস ঘরে ছাতি মেলিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম;—তিনি আমার ছাতিটা বাহিরে রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমি চটিয়া গিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছি। সঞ্জীবনীও তাঁহারা আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। ভারত গভর্ণমেণ্ট এখন আমার কথা বিশ্বাস করিবেন, না বে-সরকারী পরিদর্শক রাও সাহেব, জিলা জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কথা বিশ্বাস কবিবেন? এই ভাবেই সরকার সকল সংবাদ লইয়া থাকে, প্রকৃত ঘটনা কিছুই জানিতে চায় না। আইন অমান্যকারীদের সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট এরূপেই সংবাদ পাইয়াছেন। একজন সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কাজেই তাঁহার মিথ্যা কথাও সত্য হইয়া গেল। আর কয়েদীরা ত মিথ্যা কথা বলিয়াই থাকে,—তাহাদের কথা বিশ্বাস করা যায় না! গভর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করিতেন এবং অপরাধী-সরকারী কর্মচারীকে শাস্তি দিতেন, তবে গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইত না পরন্তু বিদ্বেষ বহ্নিও দেশে এতটা প্রবল হইত না। ১৯১৪ সনে আমি ধৃত হওয়ার পর কথা প্রসঙ্গে লোম্যান সাহেবকে বলিয়াছিলাম, দেশে অশান্তির সৃষ্টি আপনারা করাইতেছেন,—সরকারী কর্মচারী মিথ্যা মামলা সাজাইয়া, নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার করিয়া দেশে অশান্তির বীজ ছড়াইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন "তোমার সাটিরপাড়া নৌকা চুরির মামলা যে মিথ্যা ছিল, আমরা পরে তাহা জানিতে—পারিয়াছিলাম। আমি আমার ডিপার্টমেণ্ট রিফর্ম করার চেষ্টায় আছি, কিন্তু ভাল লোক পাই না।'

আমার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ আসিল যে, অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত যেন "ফোর্সড ফিডিং" (forced-feeding) না করানো হয়। আমি প্রথম প্রথম

দিন কয়েক তিন চারি গ্লাস করিয়া জল পান করিতাম এবং প্রত্যহ স্নান করিতাম। শেষ দিকে জল পান করার ইচ্ছা হইত না,—জোর করিয়া এক গ্লাস জল পান করিতাম। এইভাবে পনের ষোল দিন চলিল, তখন পর্যন্ত শয্যাশায়ী হই নাই,—হাঁটিয়া যাইয়াই প্রস্রাব করি—অবশ্য বেশী দূর চলা ফিরা করিনা, পাছে জেল কর্তৃপক্ষ আমার নামে বদনাম রটায় যে আমি নিশ্চয়ই গোপনে খাই, নতুবা কি করিয়া চলা ফিরা করি! একদিন মেডিক্যাল অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনিও একজন শ্বেতাঙ্গ ছিলেন,—আমি কি হইলে অনশন ত্যাগ করিতে পারি। আমি বলিলাম, কংগ্রেসী লোকদের উপর যদি অত্যাচার বন্ধ হয় এবং তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হয়—অর্থাৎ জেল কর্তৃপক্ষ যদি বেশী চুরি না করে, তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারি। মেডিক্যাল অফিসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া এ সম্বন্ধে আমাকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি সতর দিন পর অনশন ভঙ্গ করিলাম। ইহার কিছুদিন পর আমি 'ত্রিচিনপলি' জেলে স্থানান্তরিত হইলাম। রমেশবাবু ও রবিবাবু মাদ্রাজ হইতে সেখানে গেলেন। প্রতুলবাবু পূর্ব হইতেই সেখানে ছিলেন। আমরা এখানে আবার চারিজন একত্র হইলাম।

ত্রিচিনপলি জেলেও বহু আইন অমান্যকারী বন্দী ছিলেন এবং অনেকের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। রমেশবাবু তামিল অধিবাসীদের মত তাহাদের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন, প্রতুলবাবুও তামিল ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন। রবিবাবু ও আমি কাজ চালানোর মত ভাষা শিখিয়াছিলাম। এইখানে আমরা প্রায় দুই বৎসর থাকি। তারপর ভেলোর জেলে চালান যাই। ভেলোর জেলে তখন আইন অমান্যকারী কোন বন্দী ছিল না,—সকলেই মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মাদ্রাজে তখন কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের কেনানুর জেলের বন্ধু মালাবার নেতা শ্রীযুক্ত রামন মেনন মন্ত্রী হইয়াছেন—জেল এবং কোর্ট তাঁহার অধীন। তিনি ১৯৩৭ সনের আগষ্ট মাসে আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। আমরা পূর্বেই তাঁহার আসার সংবাদ পাইয়া চেয়ার

সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও আসিলেন। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দে দুই হাত বাড়াইয়া রমেশবাবু ও রবিবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া ফিস ফিস করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন এবং চেয়ারে না বসিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই অবস্থা দেখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবেন কিনা, বুঝিতে না পারিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মেনন তাঁহাদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমরা বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার পাঠাইয়া দিলাম। তাঁহারা বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—আর আমরা ভিতরে গল্প কবিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্ত রামন মেনন কিছুদিন আগে এই জেলে এই ইয়ার্ডেই কয়েদী অবস্থায় ছিলেন, আর এখন তিনি মন্ত্রী। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সকলেই তাঁহাকে সেলাম দিতেছে।

এইখানে আমি কারা-সংস্কার (reform) সম্পর্কে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। তখন প্রায় চব্বিশ বৎসর আমি জেলে কাটাইয়াছি। আমি বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জেলে ছিলাম—আন্দামানেও অনেকদিন কাটাইয়াছি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জেল সমূহের অবস্থাও আমার বন্ধুদের কাছে শুনিয়াছি। বহু বৎসর আমি সাধারণ কয়েদীর মত ছিলাম, স্পেশাল ক্লাস কয়েদীও ছিলাম, ডেটিনিউ, ষ্টেট প্রিজনার এবং অন্তরীণাবদ্ধও ছিলাম। আমি জেলের প্রায় সমস্ত রকম সাজা ভোগ করিয়াছি। জেল সম্বন্ধে আমার প্রায় সমস্ত রকম অভিজ্ঞতাই আছে। আমি জেলের 'সুপার' হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ কয়েদী পর্যন্ত সকলের সহিত মিশিয়াছি। জেলে কি ভাবে কি হয়, প্রায় সকল খবরই রাখি। বহু জায়গায় কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সব জায়গায়ই কারা-সংস্কারেব কথা উঠিবে। আমি মনে করিলাম, আমার অভিজ্ঞতার কথা এখন লিপিবদ্ধ করিলে কাজে লাগিবে। প্রথমতঃ আমি জেলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে লিখিলাম। তারপর লোকে অপরাধ করে কেন, জেলের সাধারণ অবস্থা, জেল কর্মচারীরা কিভাবে চুরী

করে,—কয়েদীদের প্রতি কি জন্য, কিভাবে নির্যাতন করা হয়, গভর্ণমেণ্ট কিরূপে সংবাদ পান, জেলে যুবক, বালক ও মেয়ে কয়েদীদের অবস্থা কিরূপ এবং আমার মন্তব্যে কিভাবে কারা সংস্কার হইতে পারে তাহা লিখিলাম। আমি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে বা বিশেষ কোন জেলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করি নাই, কাহারও নামে কিছু বলিও নাই, কেবল সাধারণ ভাবে জেলের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি। আমি মুক্তির কিছুকাল পর, ১৯৩৯ সনে আমার খাতাখানা প্রবাসীতে ছাপানর জন্য শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুকে দিয়াছিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া প্রবাসীতে বাহির করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং আমাকে 'চ্যাপ্টার' (chapter) গুলি সাজাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, আমি সর্বদা ঘুরাফিরা করি, আমার সময় মোটেই নাই এবং আমার দ্বারা এই কাজ ভাল হইবে না। ইহাতেই তিনি সব ঠিক করিয়া দিতে রাজী হইলেন। ইহার কয়েক মাস পর আমি পুনরায় ধৃত হই এবং খাতাখানার কোন খোঁজ করিতে পারি নাই। আমি জেলে থাকিতেই রামানন্দবাবুর মৃত্যু হয়। জানিনা, খাতাটার এখন কি অবস্থা হইয়াছে!

ভেলোরে অনেক বানর আছে, মাঝে মাঝে জেলের মধ্যেও তাহাদের আবির্ভাব হয়। একদিন আমাদের পরিচারক কয়েদীরা আমাদের ইয়ার্ডের মধ্যে একটা বানর ধরিয়াছিল। যখন বানরটিকে ধরা হইল, তখন সে অনবরত চীৎকার করিয়া তাহার বিপদ বার্তা সঙ্গীদের জানাইতে লাগিল। তাহারা দাঁত খিচাইয়া আমাদের ভয় দেখাইতে লাগিল এবং কেহ কেহ আমাদিগকে আক্রমণও করিল। তাহারা বহুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। আমরা কিছুদিন ইহাকে "ষ্টেট প্রিজনারের" হালে রাখিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গীরা মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার উকুন বাছিয়া দিয়া যাইত। আমরা তাহাদিগকেও খাইতে দিতাম। কিছুদিন পর বানরটিকে মুক্তি দেওয়া হইল। মুক্তির দিন একখানা থালায় নানা প্রকার ফল রাখিয়া তাহাকে পেট ভরিয়া খাওয়ান হইল ও গলায় ফুলের মালা পরাইয়া মুক্তি দেওয়া হইল। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সে একলাফে গাছের আগায় উঠিয়া বসিয়া রহিল এবং পরে

লাফাইয়া দেওয়ালে উঠিয়া পলায়ন করিল। বানরের মুক্তির কিছুদিন পর আমাদেরও ভেলোর জেল হইতে মুক্তির আদেশ আসিল—আমরা হিজলী জেলে স্থানান্তরিত হইলাম। হিজলীতে তখন কোন ডেটিনিউ ছিল না। আমরা ষোল জন ষ্টেট প্রিজনার বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া পুনরায় একত্র হইলাম এবং একত্রে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইল।

আমাদের হিজলী আসার পর বাঙ্গালার অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার আমাদিগকে দেখিতে আসেন। তিনি কলিকাতা হইতে সঙ্গে করিয়া বহু ফল, সন্দেশ, তরকারী ও মাছ আনিয়াছিলেন। তিনি একটার সময় আসিয়াছিলেন ও রাত্রি দশটায় চলিয়া যান। রাত্রে আমরা এক সঙ্গেই আহার করিলাম। ইহার পর স্বরাষ্ট্রসচিব নাজিমুদ্দিন সাহেব আসিলেন। তিনিও বেলা একটা হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং রাত্রে একত্র আহারও করেন। তিনি আমাদের অনেকগুলি অসুবিধা দূর করিয়া গেলেন। ইহার পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় হিজলী জেলে আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও হিজলী জেলে আমাদের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের মুক্তির চেষ্টা করিতেছিলেন।

১৯৩০ সনের পর বিপ্লব আন্দোলনে দণ্ডিত কয়েদীদিগকে আন্দামানে পাঠান হইতেছিল। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা দুইবার অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাতে তাহাদের কয়েকজনের মৃত্যুও হয়। আন্দামানের বন্দীদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনার জন্য ও সকল বন্দীদিগকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন চলিতে থাকে। আন্দামানের কতিপয় বিপ্লবী মহাত্মাকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের আর হিংসায় বিশ্বাস নাই। আমরা মহাত্মাজীকে বলিলাম, তিনি যেন তাহাদের মুক্তির চেষ্টা করেন। মহাত্মা দুই ঘণ্টা আমাদের সহিত আলাপ করিয়া বলিলেন, ইহার পর আর একবার তিনি আসিয়া তিন দিন আমাদের সহিত একত্র থাকিয়া তাঁহার মতে আমাদের বিশ্বাস লওয়াইয়া যাইবেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন

আমাদের মনের পরিবর্তন হইয়াছে কিনা। অবশ্যই আমাদের পরিবর্তন হইয়াছে বলিলেই যে আমরা মুক্তি পাইব, তিনি এইরূপ আশ্বাস দিতে পারেন না—তিনি কেবল গভর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিতে পারেন। মহাত্মার এই মধ্যস্থতার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের একটা মস্তবড় চাল ছিল। তিনি যদি এতগুলি বড় বড় বিপ্লবীদের মুখ হইতে ইহা বাহির করাইতে পারিতেন যে তাঁহারা আর হিংসায় বিশ্বাস করেন না,—মহাত্মার অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হইয়াছেন, তাহা হইলে এইসব বিপ্লবী নেতাদের ঘোষণার প্রভাব দেশের যুবকদের উপর পড়িত এবং ভবিষ্যতে দেশে গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকিত। আবার যদি কোন গণ্ডগোল হয় তবে সে সময় মহাত্মাকে দায়ী করিতে পারিত। অবশ্যই মহাত্মাজী কোন লাভের আশায় আমাদের সহিত দেখা করেন নাই, তিনি সরলভাবে সকলের মুক্তির চেষ্টাই করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মুক্তি আলোচনার ফলে যাহাদের মুক্তির আদেশ হইয়াছিল তাহাদেরও মুক্তি কিছুদিন বন্ধ রহিল।

মহাত্মা আবার আমাদের সহিত দেখা করিবেন এই সংবাদ পাওয়া গেল। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন—গরমে তাহার কষ্ট হইবে, এইজন্য গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠাইয়া দিলেন। ওখানে মহাত্মার সহিত আমাদের আবার দেখা হইল। আমরা মহাত্মাজীকে অতি বিনীত ভাবে বলিলাম যে, তিনি যেন আমাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। মহাত্মার সহিত আমরা সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছি। ইহার পর আমরা আবার হিজলী যাই এবং একে একে ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যাহারা বিনা বিচারে আটক ছিলাম, সকলেই মুক্ত হই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জেলে ষষ্ঠ বার

মুক্ত হইয়া দেশের অবস্থা কি ভয়াবহ হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলাম। ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে ইহা কেহ কল্পনাই করিতে পারে নাই যে দেশের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িবে। বহুদিন পর্যন্ত আমি বাঙ্গালা দেশের বহু সহরে ও বহু গ্রামে ঘুরিয়াছি, ইউ, পি, পাঞ্জাবেও বেড়াইয়া আসিয়াছি, মাদ্রাজ প্রদেশের সংবাদও জানি।—জমিদার, তালুকদার মহাজন, ব্যবসায়ী, সকলের অবস্থাই শোচনীয়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, কৃষক মজুরদের ত কথাই নাই; কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের অবস্থাই শোচনীয়। পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ ছিল না। যে ভারতের অতুল ঐশ্বর্যের কথা এক সময় জগৎবাসীর নিকট কিংবদন্তী স্বরূপ ছিল,—যে ভারত অফুরন্ত অন্নের জন্য অন্নপূর্ণার সন্তান বলিয়া গণ্য হইত, যে ভারতের লোকদের ধারণা ছিল "মুখ দিয়াছেন যিনি অন্ন জুটাবেন তিনি"—অর্থাৎ আহারের জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই,—আপনা হইতেই ইহা জুটিবে; আজ সেই ভারতবাসীর পেটে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই, হাতে পয়সা নাই। সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা ভারতবর্ষ—যে ভারতবর্ষ এক সময়ে পৃথিবীর স্বর্গ রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল, আজ সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে —আজ ভারতের চারিদিকে দুর্ভিক্ষের সংহার মূর্তি দেখা যাইতেছে—আজ কত মাতাপিতা শিশু সন্তানদের ক্ষুধার তাড়নায় ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ আছে কি, যে দেশের লোকের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থা? লাহোর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আমি যত জায়গায় গিয়াছি সর্বত্রই একই কথা শুনিয়াছি, টাকা, পয়সা, চাকুরী, ব্যবসার ব্যবস্থা করিয়া দিন, ঘরে খাওয়া নাই, পরনে কাপড় নাই,—ছেলের

পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিন,—মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিন ইত্যাদি। ছেলেদের যদি খাবারের ব্যবস্থা না থাকে তবে কি করিয়া তাহারা দেশের কাজ করিবে? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন মফঃস্বলে গিয়াছি, তখন এইসব প্রশ্ন কেহই উত্থাপন করে নাই, সকলেই কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তখন কাহাকেও বাড়ী ছাড়িতে বলিলে তৎক্ষণাৎ রাজী হইত, কারণ সে জানিত তাহার অভাবে তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতা না খাইয়া মরিবে না। কিন্তু এখন কাহাকেও বাড়ী ছাড়ার কথা বলিলে, সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার বাড়ীতে অন্ততঃ মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিতে পারিব কিনা? আমাদের অনেক বড় বড় ও ভাল ভাল কর্মী বাড়ীর আর্থিক দুরবস্থার জন্য দেশের কাজ ছাড়িয়া অর্থ উপার্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশ ক্রমে ক্রমে যেরূপ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে,—যদি এই ভাবে আরও কিছুদিন চলে,—যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তবে ভবিষ্যতে দেশবাসীর যে কি শোচনীয় অবস্থা হইবে তাহা কল্পনার অতীত। এই সমস্যার সমাধান বড়ই কঠিন। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন না হইলে এই সমস্যারও সমাধান হইবে না। ছেলেদের চাকুরীর জন্য আমরা অনেকদিন অনেকের পিছনে ঘুরিয়াছি, কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারি নাই।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পর আমরা অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিয়মাবলী নষ্ট করিয়া ফেলি। তখন হইতে সমিতির সভ্যদিগকে প্রতিজ্ঞা করান বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর যখন অন্যান্য দলের সহিত আমাদিগের একত্র হওয়ার প্রশ্ন উঠিল, আমরা তখন কার্যতঃ সমিতির নামও উঠাইয়া দিলাম। ১৯২০ সনের পর আমরা ক্রমশঃ সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঐ সময় অনুশীলনের কয়েকজন সভ্যকে শ্রমিক সংগঠনের জন্য নিযুক্ত করা হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল ১৯২০ সনে আন্দামান হইতে মুক্তিলাভের পর কিছুকাল জামসেদপুর শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন। অনুশীলনই সর্বপ্রথমে শ্রমিক সংগঠনে হাত দেয়। উত্তর ভারতের "হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান পার্টির" জন্ম হয় ১৯২৪ সনে কলিকাতায়—ইহার স্রষ্টা শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, প্রতুলবাবু,

ও আমি ছিলাম। পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতে অনুশীলন সমিতি "হিন্দুস্থান সোশালিষ্ট রিপাব্লিকান পার্টি" নামে পরিচিত ছিল। ভগৎ সিং আমাদের সভ্য ছিল। ১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় ভগৎ সিং পলাতক অবস্থায় আমাদের সহিত দেখা করিয়া গিয়াছিল। ভগৎ সিং খুব সাহসী এবং উৎসাহী যুবক ছিল। তাঁহার ফাঁসীর সময় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন হইয়াছিল।

১৯২৮ সনে আমাদের মুক্তির পর বাঙ্গালা দেশের সকল দলগুলিকে লইয়া একটা দল করার চেষ্টা হইয়াছিল—কাজও কিছুদূর অগ্রসর হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৯৩০ সনে ধৃত হওয়ার পর বাকসা ক্যাম্পে যাইয়া আমাদের দলের সকলকে আমরা সাম্যবাদী পুস্তক পড়িতে উপদেশ দেই এবং ক্লাস করিয়া আমরা সাম্যবাদী পুস্তক পাঠ করিতে থাকি। মাদ্রাজ প্রদেশের জেলেও আমরা সকলকে ঐ কথা বলি। আমাদের ইচ্ছা ছিল, মুক্তির পর বাহিরে যাইয়া ভারতবর্ষে একটা স্যোসালিষ্ট পার্টি দাঁড করাইব।

ইতিমধ্যে আমি ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে উত্তর ভারত ভ্রমণ করার জন্য কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই। তখন ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। সুভাষ বাবু দিল্লী ছাত্র কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার সহিত দিল্লীতে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন। আমি যখন কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই, তখন গুপ্তচর বিভাগের লোক আমাকে অনুসরণ করার জন্য আমার সঙ্গে যাইতে ছিল। আমি কলিকাতা হইতে প্রথমে কাশী যাই এবং সেখানে কয়েক দিন থাকি। পুলিশের গুপ্তচর আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে ছিল। আমি এক দিন কাশী হইতে লক্ষ্ণৌর দিকে রওয়ানা হই, পুলিশের গুপ্তচরও আমাকে অনুসরণ করিতে ছিল কিন্তু ফৈজাবাদ ষ্টেসনে গুপ্তচর আমাকে হারাইয়া ফেলে। ইহার পর আমি প্রায় দুই মাসের অধিককাল পুলিশের অজ্ঞাতসারে ইউ, পি, ও পাঞ্জাবে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করি।

দিল্লীতে আমি সুভাষ বাবুর সহিত দেখা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র কর্ম-কর্তাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সুভাষ বাবুর ইউ, পি, ভ্রমণের সময় আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। ইউ, পি, ভ্রমণের সময় দেখিয়াছি, তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন। ইউ, পি, ভ্রমণের সময় শুনিয়াছিলাম সেখানকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে গোপন সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে যে, সুভাষ বাবুর সম্বর্দ্ধনায় যেন কেহ যোগদান না করে। ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানিনা, তবে ইহা সত্য যে ইউ, পির কংগ্রেস নেতাদের কেহ সম্বর্দ্ধনায় যোগ দেন নাই। তৎ সত্ত্বেও সুভাষ বাবু ইউ, পির যে সব স্থানে গিয়াছেন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দেখার জন্য ভিড় করিয়াছে। সুভাষ বাবু অধিকাংশ স্থানে মোটর যোগেই ভ্রমণ করিয়াছেন। আগ্রা যাওয়ার সময় আমরা মোটর যোগে রওয়ানা হইয়াছিলাম। আগ্রার ময়দানে বৈকালে পাঁচটার সময় সভা হইবে ঘোষণা করা হইয়াছিল। তখন ছিল মাঘ মাস। সুভাষ বাবু যে রাস্তা দিয়া যাইবেন তাহা পূর্বেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম রাস্তায় স্থানে স্থানে গ্রামের লোক তোরণ সাজাইয়া সুভাষ বাবুকে দেখার জন্য ফুলের মালা ও খাদ্য দ্রব্য সহ অপেক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক স্থানেই মোটর থামাইতে হইয়াছে। এই ভাবে আমরা রাত্রি ৯টার সময় আগ্রা পৌছি। আমাদের বিশ্বাস ছিল আমরা সভাস্থলে যাইয়া দেখিব ময়দান শূন্য, এই মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের রাত্রে কাহারও সভায় উপস্থিত থাকার উৎসাহ থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা দেখিলাম ২৫।৩০ হাজার লোক এই উন্মুক্ত ময়দানে সুভাষ বাবুর বক্তৃতা শুনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সুভাষ বাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাঁহাকে না দেখিয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাইবে না। ইহাকেই বলে জনপ্রিয়তা। সুভাষ বাবুকে দেখার জন্য লোকের কি ভিড়? তিনি উর্দুতে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দেন।

সুভাষ বাবুর সহিত ভ্রমণ করার সময় আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের যে সব পুরাতন বন্ধু আছেন, রামগড়ে

সকলে মিলিত হইয়া ভবিষ্যতের একটা কর্মপদ্ধতি স্থির করিতে চাই। সুভাষ বাবু ইহাতে সম্মত হন। আমি সুভাষ বাবুকে বলিলাম, 'রামগড়ে যাহাতে সকলে একত্র হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত আমি করিব কিন্তু তাহাদের থাকার ব্যবস্থা সুভাষ বাবুকে করিয়া দিতে হইবে।' সুভাষ বাবু প্রস্তাব করিলেন রামগড়ে মণ্ডপ ও বাসগৃহ তৈয়ার করার সময় যেন আমাদের এক জন লোক সেখানে থাকে, তিনি তাহার পছন্দ মত ব্যবস্থা করিবেন। সুভাষ বাবুর সম্মতি ক্রমে আমরা রমেশ বাবুকে সেখানে পাঠাই। আমি উত্তর ভারতে আমাদের বন্ধুদের সহিত দেখা করিয়া তাহাদের রামগড়ে উপস্থিত হইতে বলি এবং রমেশ বাবু দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিয়া আমাদের বন্ধুদিগকে রামগড়ে উপস্থিত হইতে বলেন।

আমি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি এবং কলিকাতায় কয়েক দিন থাকার পর পূর্ববঙ্গের দিকে রওয়ানা হই। আমি ঢাকা, ময়মনসিং ও কুমিল্লা হইয়া ১০ই মার্চ চট্টগ্রাম পৌছি। আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী সাহেব পূর্বেই চট্টগ্রাম পৌছিয়াছিলেন, আমার চট্টগ্রাম যাওয়ার সংবাদও তাঁহারা জানিতেন এবং এই উপলক্ষে সভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তখন বাংলাদেশে প্রকাশ্য সভা বে-আইনী হইলেও অনেক জায়গায়ই সভা হইয়াছে, কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমি হাওড়ায় এক প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম, পুলিশ কর্মচারীরাও সেই সভায় উপস্থিত ছিল, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আমি চট্টগ্রামে আইন অমান্য করিয়া সভা করার জন্য যাই নাই।

আমার চট্টগ্রাম পৌছার পূর্বদিন সেখানে সভা হইয়াছিল এবং চৌধুরী সাহেব বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পরদিন বৈকালে সভায় আমার উপস্থিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। সেই দিন সভায় আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটী তরুণ বন্ধু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন, চৌধুরী সাহেব বক্তৃতা দিতেছেন, একটী শূন্য চেয়ার পড়িয়া আছে। আমি সভায় উপস্থিত হইয়া স্থানীয় বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদের সহিত বসিয়া পড়িলাম কিন্তু

তাঁহারা আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া সভাপতির পাশের শূন্য চেয়ারে ঠেলিয়া বসাইয়া দিলেন। আমার চেয়ারে উপবিষ্ট হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এক জন পুলিশ কর্মচারী ঘোষণা করিলেন, এই সভা বে-আইনী, এবং সভাপতি, চৌধুরী সাহেব ও আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। চেয়ারে বসিবার শাস্তি একেবারে হাতে হাতে মিলিল।

১৯২৮ সনে মুক্তির পর আমি চট্টগ্রামে যাইয়া, চট্টগ্রামের গৌরব, বাংলার জনপ্রিয় নেতা যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের বাড়ীতে ছিলাম। ৺যতীন্দ্রমোহন ছিলেন নির্ভীক দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশ তাঁর নির্ভীকতার পরিচয় বহুবার পাইয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের চট্টগ্রামের যুবকগণও নির্ভীক দেশপ্রেমিক। চট্টগ্রামের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ১৯১০ সনে, আমার অজ্ঞাতবাসের সময়। এ যাত্রা আমাদের ধৃত হওয়ার পর চট্টগ্রামের যুবকদের নির্ভীকতার পরিচয় নূতন করিয়া পাওয়া গেল। আমরা ধৃত হইয়া নিরাপদে ছিলাম কিন্তু পুলিশের লাঠির ঘা পড়িল চট্টগ্রামের যুবকদের মাথার উপর। আমাদের ধৃত হওয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত চট্টগ্রামের নির্ভীক যুবকের দল আইন অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছে, সভা করিয়াছে, পুলিশের লাঠি চার্জের সম্মুখীন হইয়াছে। জেলখানায় আমরা তাহাদের বীরত্ব ও নির্যাতন ভোগের সংবাদ পাইয়াছি। যুবকের দল লাঠির ঘা খাইয়াছে, তাহাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ; তাহারা প্রফুল্লচিত্তেই সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, কিন্তু পুলিশের লাঠির ঘা শুধু যুবকদের দেহের উপর পড়ে নাই, আমাদের মনেও সে আঘাত লাগিয়াছে। পরাধীন জাতির এইসব নির্যাতন ভোগ করিতেই হয়। বিচারে আমাদের এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। আমি চট্টগ্রাম জেল হইতে ঢাকা জেল হইয়া মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত হই।

রামগড় কংগ্রেসে যাওয়ার আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল, আমরা জামিনের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা পাই নাই। রামগড় কনফারেন্স অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। বাংলার বাহিরে আমাদের পরিচিত যে সব বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রামগড় উপস্থিত হইতে

পারেন নাই, যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এবং বাংলার বিশিষ্ট বন্ধুরা রামগড়ে একত্র মিলিত হইয়া ভারতের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (Revolutionary Socialist Party) পত্তন করেন।

আমার ধারণা ছিল এক বৎসর জেল খাটার পর আমাকে ছাড়িয়া দিবে কিন্তু আমাকে ছাড়া হয় নাই, সিকিউরিটী বন্দী হিসাবে হিজলী জেলে পাঠান হইল। পূর্বে আমরা ধৃত হইয়া বেশী দিন সকলের সহিত একত্র থাকিতে পারি নাই, আমাদিগকে পৃথক করিয়া বাংলার বাহিরে চালান দেওয়া হইত কিন্তু এ যাত্রা সে ব্যবস্থা হয় নাই। আমাদের ক্যাম্প জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না, এ যাত্রা বহু লোকের সহিত একত্র থাকায় বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, অনেকের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি। জেলে একত্র না থাকিলে লোকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।

হিজলী জেল হইতে আমরা ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হই। ঢাকা জেলে আমরা এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়াছি। জেলের ইতিহাসে, পৃথিবীর কোন স্থানে, ফ্যাসিষ্ট বন্দী শিবিরে—কোথাও সম্ভবতঃ এরূপ বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে নাই। ঢাকা জেলে প্রায় তিন শত গুণ্ডা সিকিউরিটি বন্দী ছিল। তাহাদিগকে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল। গুণ্ডা সিকিউরিটী বন্দীরা বিনা বিচারে আটক থাকার জন্য কোনই বিশেষ সুবিধা পাইত না, তাহাদিগকে কাজ করিতে হইত এবং তাহারা সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার পাইত। পুরাতন জেল কর্মচারীদিগের মনোবৃত্তি, সর্বদা অপরাধকারী (ক্রিমিন্যাল)দের সহিত থাকার জন্য ক্রিমিন্যাল হয়। তাহারা হয় হৃদয়হীন, মায়া দয়া তাহাদের কিছুই থাকে না। সাধারণ কয়েদীদের পক্ষ সমর্থন করার কেহ থাকেনা, তাই জেল কর্মচারিগণ তাহাদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করে। ঢাকা জেলের গুণ্ডা কয়েদীরা জেল কর্তৃপক্ষের নিকট কতকগুলি সুযোগ সুবিধা চাহিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, তাহারা কয়েদী নয়, বিনা বিচারে আটক আছে, তাহাদের ভাল খাওয়া ও বিড়ির ব্যবস্থা না করিলে তাহারা কাজ করিবে না। তাহাদের এই দাবী জেল কর্তৃপক্ষের সহ্য হইল না।

গুণ্ডা সিকিউরিটী বন্দীদিগকে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। পরদিন প্রাতে তাহাদের কয়েক জন প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট তাহাদের অভিযোগ নিবেদন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদিগকে সুপারের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল, সুপার তাহাদিগকে ধমকাইলেন, গালি দিলেন, সুপারের সহিত তাহাদের বচসা হইল, শ্বেতাঙ্গ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কৃষ্ণকায় কয়েদীর অবাধ্যতায় উত্তেজিত হইয়া সে-খানেই কয়েকজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। এই ঘটনায় অন্যান্য কয়েদীরা উত্তেজিত হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। এই ঘটনায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বন্দুকসহ সদলবলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ দিলেন। হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। এই হত্যাকাণ্ডের সময় অনেকে প্রাণভয়ে গাছের উপর উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইল, অনেকে পায়খানায় লুকাইল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিল, কেহ কেহ তাহাদের ইয়ার্ডের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অপর ইয়ার্ডে লাফাইয়া পড়িল, সেখানে জেলের কয়েদী মেট পাহারা তাহাদের লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করিল। প্রায় ৫০ জন লোক হত হইল, সকলেই আহত হইল, অক্ষত কেহ ছিল না।

গুণ্ডা সিকিউরিটীরা আমাদের পাশের ইয়ার্ডেই ছিল, আমাদের ৫নং ব্যারাকের দোতালা, তেতালা হইতে সবই দেখা যাইত, আমরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কেহ অন্য প্রকার বলিলে তাহা বিশ্বাস করিব না। এই হত্যাকাণ্ডের পর জেল কর্তৃপক্ষ মোটেই অনুতপ্ত হন নাই, বরং ইহাকেই মূলধন করিয়া আরও লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, তাহাদের পদোন্নতি ও উপাধি লাভ হইয়াছে। জেল কর্তৃপক্ষ ইহাই প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন, কয়েদীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারা গুলি করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন মাত্র। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব এবং জেলের আই, জি এই ঘটনার তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন—তাঁহারা সকল কথাই শুনিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ঢাকা জেলের হত্যাকাণ্ডের বিতর্কের সময় প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব প্রকাশ্য তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন

কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধীদিগের কোন শাস্তি হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা যদি অপরাধীর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন তবে সম্ভবতঃ কোন ক্ষতি হইত না। সম্ভবতঃ শেতাঙ্গ কর্মচারী জড়িত আছেন বলিয়াই তাহা হয় নাই।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিরাপত্তা রক্ষার্থে যখন ব্যাপকভাবে দেশসেবকদের গ্রেপ্তার করিয়া সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহাদের উপর সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইয়াছিল, পরে তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর অধিকার দেওয়া হয়। সিকিউরিটি বন্দীগণ ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষবাবুর নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি জেলে অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল, হিজলী স্পেসাল জেল প্রভৃতি জেলেও বন্দীরা এই সময় অনশন করেন। এই অনশন ব্রতের সময় অনুশীলন সমিতির ৭০ জন সভ্য এবং অপর দলের আট-জন সভ্য সুভাষবাবুর সহিত অনশন করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সিকিউরিটি বন্দীগণ সুভাষবাবুর অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন নাই—তাহারা অনশন ধর্ম-ঘটীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য পাঁচ দিন একবেলা উপবাস করিয়াছিলেন। এই অনশন ধর্মঘট ২৩ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এই অনশনের সময় সুভাষবাবু ও প্রতুলবাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ে এবং এজন্য তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই অনশন ব্রতের ফলে সিকিউরিটি বন্দীদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আগষ্ট বিপ্লব ও তাহার পর

বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে। যখনই স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক আসিয়াছে, অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ তখনই সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করার পর হইতে অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ আন্তরিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছে। ১৯৩০ সনে জাতীয় কংগ্রেস যখন আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিল তখন অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ঐ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া শুধু কারাবরণ করেন নাই, লাঠি চার্জের সম্মুখীনও হইয়াছেন। বিপ্লবীরা দেখাইয়াছে, তাহারা যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে জানে, পিস্তল ছুঁড়িতে পারে—আবার খাঁটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় নীরবে লাঠির আঘাতও সহ্য করিতে পারে।

সুভাষবাবু যখন জাতীয় কংগ্রেসকে আপোষ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামশীল করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ সুভাষ-বাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছিল। অনুশীলনের সভ্যগণ সুভাষবাবুর নির্দেশে আইন অমান্য করিয়া সভা করিল, কারাবরণ করিল—সুভাষবাবুর স্বপ্ন সফল করার চেষ্টা করিল।

১৯৪২ সনের ৯ই আগষ্ট, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে ভারতব্যাপী যে গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তাহাই আগষ্ট বিপ্লব। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে এত বড় বিপ্লব আর দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর শোষিত, নির্যাতিত জনসমূহের একদিকে যেমন দুঃখ কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল আবার তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও

স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল। পৃথিবীর সর্বত্রই পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল—ভারতবাসীও নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারে না। আইন সভার অন্তঃসারশূন্যতা দেশবাসী উপলব্ধি করিয়াছে, ভারতবাসী শিশু নয়—চুষিকাঠি লইয়া খেলা করার অবস্থা পার হইয়াছে, মেকী আইন সভার মায়া তাহারা কাটাইয়াছে, তাহারা চায় প্রকৃত ক্ষমতা হাতে পাইতে। ভারতবাসী জানে প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসিবে,—বৃটিশ মন্ত্রীসভার অনুগ্রহের দানে নয়। আগষ্ট বিপ্লব ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

অনুশীলনের সভ্যগণ, যাহারা বাঙ্গালা দেশে বা বাঙ্গালার বাহিরে ছিল, সকলেই সক্রিয়ভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়াছে, কেহ কেহ পুলিশের গুলিতে হত হইয়াছে, কেহ কেহ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, বহুলোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, লাঠির আঘাত সহ্য করিয়াছে এবং বহুলোক নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। জেলের ভিতরে যাহারা পূর্ব হইতেই আবদ্ধ ছিল তাহারাও এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন এক শ্রেণীর লোক দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা ভারতের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয় নাই ; রুশিয়ার বন্ধু বলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই তখন কার্যতঃ সমর্থন করিয়াছে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ ভারতবাসীর জনযুদ্ধ ছিল না।

আগষ্ট বিপ্লবের সময় ভারতবাসী অসীম বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের পরিচয় দিয়াছে—তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়াছে। একটা নিরস্ত্র জাতি কিভাবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রবল প্রতাপশালী গভর্ণমেণ্টকে পঙ্গু করিতে পারে তাহা তাহারা দেখাইয়াছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সুসভ্য বৃটিশ জাতির স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। একটা সুসভ্য জাতি অপর জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমন করার জন্য কতটা নিষ্ঠুর হইতে পারে—দমন নীতির মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঘটনাবলী

প্রকাশ হইলে জার্মান বর্বরতা, জাপানী বর্বরতা তাহার নিকট ম্লান হইয়া পড়িবে—আদিম যুগের অসভ্য বর্বর জাতিও এই সব ঘটনাবলী শুনিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে।

আমাদের বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত অক্ষশক্তির নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধ অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছেন, মিত্রপক্ষের বন্দী সৈন্যদিগের উপর যে-সব অক্ষ-শক্তির কর্মচারী অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়াছেন। শত্রুপক্ষের পরাজিত বন্দীদের অপরাধ প্রমাণ করিতে বিজয়ী মিত্রপক্ষের কোন বেগ পাইতে হয় না, তাহাদের অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে এবং তাহারা চরম দণ্ড ভোগ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কি জেলে বা জেলের বাহিরে, নিরস্ত্র দেশপ্রেমিকদিগের উপর এবং দেশের জনসাধারণের উপর সুসভ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণ যে সব অত্যাচার করিয়াছে তাহার বিচার কে করিবে? পরাধীন জাতির বিচার করার ক্ষমতা নাই। বিচারালয়ে যাইয়াও তাহাদের কোন লাভ নাই, কারণ তাহাদেরই নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহারা অবিচার করিয়াছে। পরাধীন জাতি সুবিচার পায় না—তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকে; শত শত বৎসরের অত্যাচার অবিচারের সুবিচার তাহারাই করিবে যখন তাহাদের সুদিন আসিবে।

আমরা যখন জেলে আবদ্ধ ছিলাম তখন ঢাকা সহরে এবং মহেশ্বরদী পরগণায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। বর্তমান সভ্যতার যুগে পৃথিবীতে কেহ সাম্প্রদায়িকতার কথা কল্পনা করিতে পারেনা,—একমাত্র পরাধীন ভারতেই ইহা সম্ভবপর। পরাধীনতার নিত্য সহচর হিসাবে ইহা থাকিবে এবং যখনই স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিবে তখনই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন দেখা দিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ গরীব লোক। তাহারাই মৃত্যু বরণ করে, তাহারাই উপবাসী থাকে, তাহাদেরই জেল হয়, মামলা চালাইতে তাহাদেরই বাড়ীঘর বিক্রয় করিতে হয়। যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়

তাহারা বড়লোক, তাহাদের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তাহারা লাভবানই হয়। আর লাভবান হয় গুণ্ডা শ্রেণীর লোক। যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় তাহারা এবং গুণ্ডা শ্রেণীর লোক কেহই মরে না; সাধারণ লোক, যে কিছুই জানে না, কোন অপরাধ করে নাই—এই শ্রেণীর লোকই প্রাণ হারায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো যেমন কঠিন নয় আবার দাঙ্গা বন্ধ করাও কঠিন নয়। দাঙ্গা যে বন্ধ হয় না, ক্রমাগত দিনের পর দিন চলিতে থাকে, তাহার কারণ গভর্ণমেণ্টের দুর্বলতা। গভর্ণমেণ্ট দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য যদি কৃতনিশ্চয় হয় এবং একটু শক্ত হয় তবে দাঙ্গা বেশীদিন চলিতে পারে না। কিন্তু দাঙ্গাকারীদের মনে যদি এই ভরসা থাকে যে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পিছনে আছে, তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহারা দেখিতে পায়, দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা নাই, তাহা হইলে দাঙ্গা বন্ধ হইবে না, বহুদিন চলিবে।

দাঙ্গা কাহারা বাধায় গভর্ণমেণ্টের তাহা জানা উচিত। গভর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন, যদি তাহাদের সুদীর্ঘ কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হইবে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মনে যদি এই ভয় থাকে, দাঙ্গা বন্ধ করিতে না পারিলে তাহাদের অকর্মণ্যতার জন্য তাহাদের চাকুরি থাকিবে না. তাহা হইলেও দাঙ্গা বন্ধ হইবে। দেশের জনসাধারণের মনে যদি এই বিশ্বাস জন্মে, দাঙ্গার ফলে তাহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, লাভবান হইতেছে অপর এক শ্রেণীর লোক; তাহারা কতিপয় বড়লোকের জন্য প্রাণ দিতেছে—প্রতারিত হইতেছে তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হইবে। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব নাই, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোক সময় সময় দেশের জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধর্মের নামে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া কার্য হাসিল করে। দেশের জনসাধারণ আর অধিক দিন প্রতারিত হইবে না।

এই কয় বৎসর বাঙ্গালার উপর দিয়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্রসঙ্কট প্রভৃতি গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নরনারী বস্ত্রের অভাবে উলঙ্গ, অর্দ্ধ উলঙ্গ রহিয়াছে,—আমরা সে দৃশ্য দেখি নাই, দেশবাসীর এই দুর্দিনে তাহাদের সেবা করার সুযোগ পাই নাই। হয়ত আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারিতাম না, অন্ততঃ আমাদের মনে একটা সান্ত্বনা থাকিত যে আমরা দেশবাসীর বিপদের সময় তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া, তাহাদেরই মত একজন ভুক্তভোগী হইয়া, তাহাদের সেবা করার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালার এই দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসঙ্কট মনুষ্যকৃত, ইহার জন্য দায়ী প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলী, লোভী ব্যবসায়িগণ এবং সর্বোপরি দায়ী বিদেশী গভর্ণমেণ্ট। পরাধীনতা যতদিন থাকিবে নিত্য নূতন সমস্যা দেখা দিবে, দেশবাসীর আরও অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে—পরাধীনতার সহচর হিসাবে তাহারা চিরকাল লাগিয়াই থাকিবে।

যুদ্ধরত দেশগুলিতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্র-সঙ্কটের কথা শুনা যায় নাই, জার্মানী বা জাপানের অধিকৃত দেশে খাদ্যাভাব বা বস্ত্রাভাবের কথা শুনা যায় নাই বরং অধিকৃত দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য ছিল এরূপ প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে শস্য নষ্ট হইয়াছিল এরূপ কোন কথা উঠে নাই। ভারতবর্ষে খাদ্যের অভাব ছিল না, যথেষ্ট খাদ্যশস্য গুদামে মজুদ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মণ চাউল, ডাইল, আটা গুদামে পচিয়া নষ্ট হইয়াছে—কিন্তু মানুষকে খাইতে দিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচান হয় নাই। কোন স্বাধীন দেশে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে দেশে বিপ্লব হইত, গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন ঘটিত। কোন স্বাধীন দেশে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে দেশের জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিত, অপরাধীর শাস্তি হইত, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইত। কিন্তু পরাধীন দেশে কেহ দায়ী হয় না! পরাধীন দেশে বিদেশী সরকারের আওতায় পুষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলী ও ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যাহারা বিদেশী সরকারের স্তম্ভস্বরূপ, তাহাদের কোন অপরাধই অপরাধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কারণ তাহাদের

সবচেয়ে বড় গুণ তাহারা বিদেশী সরকারের অনুরক্ত। একমাত্র স্বাধীন ভারতই সকল সমস্যা সমাধান করিবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি ইহাও জানিতেন যে ভারতবর্ষে একটা বৈপ্লবিক আবহাওয়া চলিতেছে। তাই তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের জন্য ভারতের বিপ্লবী-শক্তিগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁর প্রথম কল্পনায় ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতবর্ষেই হইবে। অনুশীলন সমিতি সুভাষবাবুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সুভাষবাবু ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত একমত না হওয়ায় তিনি দেশে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি যখন দেখিলেন, সুযোগ চলিয়া যাইতেছে, তখন তিনি রাসবিহারী বসুর পথ অবলম্বন করিলেন—তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন। তিনি এই আশায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন যে, যদি ভারতের বাহিরে যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিছু করিতে পারেন। ইহার সুযোগও মিলিল। বৃটিশ সৈন্যদের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শক্তির উপর ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বাস নষ্ট হইল। আবার বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদের সহানুভূতি হারাইল। সর্বোপরি ভারতীয় সৈন্যগণ পৃথিবীর স্বাধীন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া মর্মে মর্মে ইহাই অনুভব করিতে লাগিল, "আমরা পরাধীন, পৃথিবীর স্বাধীন জাতি সমূহের ঘৃণার পাত্র।" তাহারা দেখিল পৃথিবীর সব জাতিই নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, আর কেবল তাহারাই গোলামীর জন্য প্রাণ দিতেছে। তাহারা দেখিতে পাইল, স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা নাই। এক দেশ, এক জাতির বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ, তখন তাহাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ জাগিল, তাহারাও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু ১৯১৫ সনের ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে, জাপানে যাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য জমি প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং জাপানে 'স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ' (Indian Independence League) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বসু তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও সংগঠন শক্তি প্রভাবে জাপানবাসীদের ও জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জাপানে রাজপরিবার, সেনাপতিমণ্ডলী ও জনসাধারণের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি তাঁহার সেই প্রভাব ভারতের স্বাধীনতার কাজে লাগাইয়াছিলেন। অনুশীলন সমিতির আর একজন সভ্য স্বামী সত্যানন্দ (তাহার পূর্ব নাম ছিল, প্রফুল্ল সেন, বাড়ী ফরিদপুর জেলায়) শ্যামে থাকিয়া রাসবিহারী বাবুর সহযোগে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আভাষ তাঁহারা পাইয়াছিলেন। বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা লইয়া কার্যে অবতীর্ণ হন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ও স্বামী সত্যানন্দ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। স্বামী সত্যানন্দ ১৯৩৬ সনে শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্যাম দেশে তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৯৩৭ সনে টোকিওতে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে স্বামী সত্যানন্দ, গিয়ানী প্রিতম সিং প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতে বদ্ধপরিকর হন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশের পরাজয় ঘটিলে, বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং প্রভৃতি দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নেতাগণ বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টায়ই প্রথম "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গড়িয়া উঠে। ১৯৪২ সনের ২৮শে হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত রাসবিহারী বসুর নির্দেশে টোকিওতে 'স্বাধীন-ভারত-সঙ্ঘের' এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য ব্যাঙ্কক হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি

বিমানযোগে রওয়ানা হন। তাহাদের মধ্যে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রিতম সিং ও ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ ছিলেন। পথিমধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

প্রথম "আজাদ হিন্দ ফৌজ" ভাঙ্গিয়া গেলে, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর চেষ্টায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জার্মানী হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আনানো হয়। বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপর সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া নেতাজীর সহকর্মী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। শ্রীযুত রাসবিহারী বসু "আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের" সর্বোচ্চ পরামর্শ-দাতা ছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় পদার্পণ করিলে অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ যাঁহারা মালয়, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানে পূর্ব হইতেই ছিলেন তাঁহারা সকলেই নেতাজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিযুক্ত হন। নেতাজী অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সভ্যকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া ছিলেন—ডাঃ পবিত্র রায় তাঁহাদের অন্যতম। পবিত্র বাবু কয়েকজন বন্ধুসহ ধৃত হন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অবস্থায় আলীপুর জেলে অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন :

"দাদা, নানাজনের নানা অভিমত থাকা সত্ত্বেও সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম আমরা জানাইতে চাই যে, জাপানে বা জাপানীদের তরফ থেকে কোন কাজ করার ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা এদেশে আসিনি, বা ও-দেশে যে বিরাট সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার পেছনেও এমনধারা কোন চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই। ওদেশে এবং এদেশে আমাদের যা কিছু কর্মপ্রচেষ্টা এবং যারা এদেশে আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বা সাহায্য করেছে; আমাদের বা তাদের কারুর এমনধারা কোন ধারণার পিছনে ছুটে চলবার কোন ইঙ্গিত নেই। এটা নিশ্চয় জানবেন ভারতবর্ষে স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে ও তাহারই আশু সমাধানের জন্য আমাদের যা কিছু কর্মধারা।

"১৯৪২ সনে পূর্ব এশিয়ায় ইংরাজের পরাজয়ের ফলে তখনকার সমগ্র রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে যায়। যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির

পরিকল্পনা এতদিন ধরে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু চৌকিওতে বসে করে আসছিলেন হঠাৎ অতর্কিতে তার সুযোগ এলো। রাসবিহারী বসু এবং আপনাদের পরিচিত যে দুইজন বাঙ্গালী বহুকাল যাবৎ ব্যাঙ্ককে অজ্ঞাতবাস করছিলেন এবং যারা সমগ্র শ্যামদেশের উপর ভারতীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং অবাঙ্গালী পূর্ব ভারতীয় যাঁরা সমগ্র পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রভাবশালী লোক ছিলেন এবং পূর্ব বিপ্লবযুগের (১৯১৫) যাঁহারা ছিলেন, সেই সব নেতাগণ যাঁদের মাতৃভূমির জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণ আজ বেশীর ভাগ ভারতবাসীর কাছে অজ্ঞাত—এমন সব নির্যাতিত নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ভারতীয়গণ, আন্তর্জাতিক যে সুযোগ আপনি তাদের সামনে এসে পৌঁছে গেল তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন। তাহারই ফলে সৃষ্টি হল ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'। এই লীগের আদর্শ—উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা, বিশেষ করে এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ—জাপান এই সুযোগের স্রষ্টা। তাই লীগের সঙ্গে তার খানিকটা সম্বন্ধ রাখতে হলো। সে সম্বন্ধ শুধু রাজনৈতিক। ইংরেজ জাপানের শত্রু এবং তাই ইংরেজ ভারতবাসী হিসেবে আমাদের শত্রু। জাপান চায় তার যুদ্ধ জয়ের নীতির দিক থেকে ইংরেজের ধ্বংস। আমরাও চাই ভারতের দিক থেকে তার ধ্বংস। জাপান ও লীগের এই চিন্তাধারার ঐক্যই তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের যোগসূত্র। এছাড়া জাপানের ভারতবর্ষের উপরে রাজনৈতিক কোন মতলব ছিল না বা নেই। এটা সত্য ও অতি সত্য। বিশেষ করে যেখানে আমরা দেখেছি যে জাপান বর্মা ও ফিলিপাইন অধিকারের পর সেই সব দেশের স্বাধীনতা দান করেছে ও সেইসব দেশের লোকের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়া ছোট ছোট বিজিত দেশের প্রতি ইংরেজের পূর্বকার ব্যবহার (রাজনৈতিক) ও জাপানের বর্তমান ব্যবস্থা তুলনা করে আমরা জাপানের পররাষ্ট্রনীতির যে পরিচয় পেলাম, তাতে ভাবীকালে ভারতের প্রতি তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মালয়ের বর্মার নিজস্ব শাসন-

প্রণালী দেখেছি এবং যুদ্ধ থাকা কালীন ওখানকার শাসন ব্যবস্থা যেরূপ আত্ম নিয়ন্ত্রণ লাভ করলো তাতে আমরা জাপানীদের অবিশ্বাস করবার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। এরপর আমাদের অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন আন্দামান ও নিকোবর সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো তখন জাপানীদের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করবার আমাদের আর কিছু থাকলো না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আন্দামানে ও নিকোবরে গিয়েছি ও সেখানে দেখে এসেছি এবং আমাদের তখনকার জন্য যদিও সেখানে জাপানী সেনা রয়েছে তবুও সেখানে "প্রভিসনাল গভর্ণমেন্টের" কর্ণেল লোকনাথন স্থানীয় শাসন পরিচালনা করছেন।

"যদিও ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি 'লীগ' তার কাজ সুরু করেছিলো তবুও প্রশ্ন হ'তে পারে যে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় ঐ দেশ হতে 'লীগের' কোন সাড়া পাওয়া গেল না কেন? তার কারণ তখন 'লীগের' নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ৫০।৬০ হাজারের বেশী হয় নাই এবং তারা সবাই ভূতপূর্ব বন্দী ইংরেজ সৈন্যদলের পরিত্যক্ত অংশ মাত্র। জাপানীরা তখন 'লীগের' আন্দোলনকে ভারতের মধ্যে একটা নৈতিক সমর্থন লাভ করবার জন্য বিশেষ জোর দেয় এবং 'লীগ'ও তখন ভারতে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য তার কাজ চালাবার সিদ্ধান্ত করে।

"এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবুকে ওদেশ হতে আনবার জন্য সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ দাবী করা হয় এবং তারই ফলে ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি সময়ে সুভাষবাবু এসে 'লীগের' নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। সুভাষবাবু আসার ফলে সমস্ত আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হয়। Indian National Army গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে দিনের পর দিন দ্রুত হাজার হাজার ভারতীয় I. N. A. বাহিনীতে যোগদান করতে আরম্ভ করেন। আপনারা জানেন বোধ হয় একটি নারী বাহিনীও গঠিত হয়। পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসীমাত্রই নিজেদেরকে উজাড় করে এরই পেছনে এসে দাঁড়ায়। তাদের

অর্থে সামর্থে এবং পিতাপুত্র জননী ভগিনী তাদের প্রাণ উৎসর্গ করবার জন্য এতটুকু দ্বিধা করেনি। এই আই, এন, এর সমগ্র খরচ, তার সাজ পোষাক তার খোরাক বেতন সমস্ত ভারতবাসীর অর্থে পুষ্ট। কিভাবে মানুষ সুভাষবাবুর হাতে সর্বস্ব দেবার জন্য উন্মত্ত হয়েছিল আমার একদিনকার অভিজ্ঞতা জানাচ্ছি। পেনাংএর এক সভায় অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণ থেকে প্রায় তিন লক্ষ ডলার অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা আই, এন, এর জন্য আমি সুভাষবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখেছি। এমনি করে দিনের পর দিন পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন দেশ থেকে আই, এন, এর জন্য কোটি কোটি টাকা স্বেচ্ছায় এসেছে।

"১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে "প্রভিসনাল গভর্ণমেণ্ট" গঠিত হয় এবং সাথে সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে লোক এসে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে সুরু করে— আমরা অবশ্য এর বহু পূর্বেই যোগদান করেছিলাম। আমরা অর্থাৎ "অনুশীলন সমিতির" যে কয়জন ওখানে ছিলাম সকলে সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিশেষ বিবেচনা এবং পরামর্শ করে একমত হয়ে এর সাথে দলগতভাবে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করে সকলেই যোগদান করলাম। হয়ত আপনাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাদের চিনতে পারবেন এমন কয়েক জনের নাম জানালাম।

"স্বামী সত্যানন্দ পুরী বহুকাল ব্যাঙ্ককে ছিলেন। যদিও তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন, তবুও তাঁর সন্ন্যাসের মূলমন্ত্র ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। জন্মভূমির পূর্ণস্বাধীনতার জন্যে আত্মবিসর্জনে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। সমগ্র শ্যামদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক গুরু বা নেতা। ব্যাঙ্ককের রাজদরবারেও তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন ও প্রভাব ছিল। ১৯৪২ সালে রাসবিহারী বসু প্রথম স্বামীজীর ওখানে আসেন এবং সমগ্র পূর্ব এশিয়াকে কেন্দ্র করে "ইণ্ডিয়া লীগ" গঠনের প্রথম পরিকল্পনা তাঁর (স্বামীজীর) ওখানে হয়। এজন্য ব্যাঙ্ককেই 'লীগের' হেড কোয়ার্টার প্রথম স্থাপিত হয়।

"শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বসু যে দু-জনের একান্ত সাহায্যে 'লীগকে' সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের একজন এই স্বামী সত্যানন্দ পুরী ও অপরজন শ্রদ্ধেয় প্রিতম সিংজী। কিন্তু আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে স্বামীজী ও সিংজী কেহই আর ইহজগতে নাই। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে টোকিও সম্মেলনে যাবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় আরো কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সাথে তাঁরা মারা যান। এঁদের মৃত্যুতে 'লীগ' পরিকল্পনার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল আজো তার পূরণ হলো না।

"বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা লিখতে গেলে একটা বিরাট ইতিহাস লিখতে হয়। তাও এখন সম্ভব নয়। আমার সাথে তাঁর তিন চার দিন যে আলাপ হয়েছিলো, তার থেকে একটা কথাই শুধু স্পষ্ট করে বুঝেছিলাম যে স্বাধীন ভারতে ফিরে আসবার একটা প্রবল আগ্রহ তাঁর মধ্যে সদাসর্বদাই ছিলো। তিনি ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতাদের কথা আমাদের সঙ্গে আলাপে বলেছিলেন। বিশেষ করে বিপ্লব যুগের কারো কথা তিনি ভুলেন নাই।......আপনাদের মধ্যে যাদের তিনি দেখেছেন তাদের কারুর কথাই এতটুকু বিস্মৃত হন নাই; বরং আমাদের সাথে সে-সব পুরানো স্মৃতি আলোচনা করবার কালে বালক সুলভ আনন্দে মেতে উঠতেন। বয়স যথেষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু উৎসাহ ছিল প্রচুর। নেতাজী সুভাষবাবু আসবার পর সমগ্র দায়িত্ব ও কর্মভার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নেতাজীর উপর তুলে দিয়ে রাসবিহারী বাবু অসুস্থ শরীরে জাপানে ফিরে যান। আমার সাথে সেই তাঁর শেষ দেখা। আমরা আসবার পূর্বে নেতাজী সুভাষবাবুর কাছ থেকে আদেশ ও উপদেশ নিয়ে এসেছিলাম। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার সময় তিনি আপনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহায়তা আপনার কাছ থেকে আসবেই। আমাকে ঐ সময়ে পাঠাবার বিশেষ কারণ ছিলো যাতে আপনার সাথে এ সম্পর্কে পাকাপাকি আলাপ আলোচনা করে আমরা কাজে অগ্রসর হতে পারি। আমি আসবার পূর্বে বাঙ্গালাদেশের সমগ্র আবহাওয়াকে রাজনৈতিক

ভাবে বিশ্লেষণ করে আপনার সাথে কথা বলার গুরুত্ব, প্রয়োজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে একাজে এগিয়ে আসবেন এবং ভারতের ভিতর থেকে আপনাদের সমগ্র সাহায্য পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস আমি নেতাজীর মধ্যে দেখেছিলাম। ওখানকার সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পরিষ্কার করে আপনাকে জানাবার হুকুম আমার উপর ছিল। দুঃখের কথা, বহু চেষ্টা করেও এসব কথা আপনাকে জানাবার কোন পথ বা সুযোগ করতে পারিনি। দীর্ঘকাল বাঙ্গালার বাইরে থেকে এবং এসে পর্যন্ত গুপ্তভাবে অবস্থান করবার চেষ্টাতে আমরা পূর্বপরিচিত কোন বন্ধুর সহিত দেখা করতেই পারিনি। মোটামুটি কিছুটা আপনাকে জানান গেল; আপনি বুঝতে পারেন, সব কথা এভাবে লেখা যায় না এবং এভাবে লিখিত আলোচনাও করা চলে না। তবুও যতটা সম্ভব লিখে জানালাম। বিদায়—জয় হিন্দ।"

এখন একটা প্রশ্ন এই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন কি?

আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাই, যদি আমরা পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করি, তবে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক পরাধীন জাতি বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। যদি তাহারা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করিত, তবে তাহারা স্বাধীন হইতে পারিত না। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ যদি অন্যায় হয়, তবে জর্জ ওয়াশিংটন, লেনিন, সান-ইয়াৎ-সেন, ডি-ভ্যালেরা, পিলসুডস্কী সকলেই অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস সেকথা বলে না, সেই সব দেশের অধিবাসিগণ সে কথা বলিবে না—আমেরিকার অধিবাসিগণ স্বীকার করিবে না, জর্জ ওয়াশিংটন ভুল করিয়াছিলেন। জেনারেল দ্য-গল ও মার্শাল টিটো বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন কি? বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ জেনারেল দ্য-গল ও মার্শাল টিটোকে কুইসলিং না বলিয়া তাহাদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করিয়াছিল কেন?

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও আমেরিকা, জার্মানী ও জাপানের অধীনস্থ জাতিসমূহকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য উৎসাহিত করে নাই কি? সেই সব পরাধীন জাতিকে সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য বৃটিশ ও আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করে নাই কি? বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ, জার্মান কবলিত রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীদের ধ্বংসাত্মক কার্য—সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকে দেশপ্রেমিকদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করে নাই কি? তাদের ধ্বংসাত্মক কার্য যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চোখে দেশপ্রেমিকের কার্য বলিয়া গণ্য হয় তবে আগষ্ট বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কাজ দেশপ্রেমিকদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে না কেন?—আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া গণ্য হইবেই বা না কেন?

ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিল কি? ইংলণ্ডের অধিবাসীদের যদি তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকার থাকে, তবে ভারতবাসীর তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার অধিকার থাকিবে না কেন? বৃটিশ সৈনিকগণ তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করিতে পারে, তবে ভারতীয় সৈন্যগণ তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারিবে না কেন? যে নীতি ইংলণ্ডের পক্ষে খাটিবে সেই নীতি ভারতবর্ষের পক্ষে খাটিবে না কেন? যে নীতি ইংলণ্ডের শত্রুপক্ষের দেশে প্রযোজ্য, সেই নীতি ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশে প্রযোজ্য হইবে না কেন?

এখন প্রশ্ন এই, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট পরাধীন জাতির বিপ্লবীদের সাহায্য করে কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় কোন রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্র যতই উদার হউক না—কোন পরাধীন জাতিকে সাহায্য করে না। কারণ ঐরূপ সাহায্য করায় তাহার নিজের বিপদ আসিতে পারে—অপর রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষ হইতে পারে। একটা পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য কোন রাষ্ট্রই নিজের ঘাড়ে বিপদ ডাকিয়া আনিবে না। কিন্তু একটা রাষ্ট্রের সহিত যখন অপর রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধে, স্বেচ্ছায়

প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার শত্রুর অধীনস্থ দেশে বিপ্লব করিবার জন্য সেই সেই দেশের বিপ্লবী দলকে সাহায্য করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বিপ্লবী দলের সহিত জার্মান গভর্ণমেণ্টের এই সন্ধি হইয়াছিল—"জার্মান গভর্ণমেণ্ট ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিবে, ভারতবর্ষে বিপ্লব করিবার জন্য জার্মান গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাহায্য করিবে।" এখন প্রশ্ন এই যে, এই সাহায্য করিবার পিছনে জার্মানীর কি স্বার্থ ছিল ? জার্মানী জানিত তাহার প্রধান শত্রু ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের শক্তির মূল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে যদি বিপ্লব হয়, ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হয়, তবে ইংলণ্ড দুর্বল হইবে এবং সহজেই জার্মানী ইংলণ্ডকে পরাজিত করিতে পারিবে। জার্মানীর সাহায্যে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তবে ভারতবর্ষ জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র হইবে এবং পৃথিবীতে জার্মানীর কোন ভয় থাকিবে না। জার্মানীর ইহাই ছিল বড় স্বার্থ বা লাভ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পথ—স্বাধীনতার পথ—সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। এই পথেই পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস এই পথেরই নির্দেশ দেয়। তাহাদের পথ যদি ভুল হয় তবে পৃথিবীর ইতিহাস ভুল।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য যখন এই সমস্ত বীরগণ মৃত্যুপণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন ভাগ্যের পরিহাসে আমি তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইতে পারি নাই। ইংরেজের বন্দীশালায় জীবন কাটিবে ইহাই ছিল কপালের লেখা।

অবশেষে ২৩শে মে (১৯৪৬) দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে বেলা ১২টার সময় মুক্তি পাইলাম। ফিরিয়া দেখি দেশের চেহারা ইতিমধ্যে বদলাইয়া গিয়াছে, যেন এই কয়েক বৎসরেই স্বাধীনতার পথে অনেক পা আগাইয়া গিয়াছে।

পরিশিষ্ট

অনুশীলন সমিতি

একটা জাতি যখন জাগে তখন হঠাৎ জাগে না, অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিলে হঠাৎ যেমন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়, সেইরূপ কোন যাদুমন্ত্রে হঠাৎ কোন সুপ্ত জাতির তমিস্রা রজনীর অবসান হয় না। জাতি জাগে ধীরে ধীরে, তার পিছনে থাকে বহু নীরব নিঃস্বার্থপর কর্মীর বহু দিনের সাধনা। একটা জাতির মধ্যে যখন জাগরণ আসে তখন তাহা নানা ভাবে প্রকাশ পায়; অরুণোদয় হইলেই মনে হয় সূর্য উঠিতেছে। ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রথম অরুণোদয় হয় সিপাহী বিপ্লবের যুগে। তখন অরুণোদয় হইলেও ভারতের ভাগ্যাকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, সূর্যোদয় দেখা যায় নাই, সূর্যোদয়ের আভাস পাওয়া গিয়াছে স্বদেশী আন্দোলনের সময়।

পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ক্রমবিকাশের ধারা আছে, তাহা ধাপে ধাপে চলে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল; হঠাৎ আমরা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাই নাই। অতীতের অভিজ্ঞতার ফল বর্তমান পৃথিবী এবং বর্তমান পৃথিবীরও রূপ পরিবর্তন হইবে, বর্তমান অভিজ্ঞতার ফলে পৃথিবী নূতন রূপ ধারণ করিবে। স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একটা ক্রমবিকাশের ধারা আছে, তাহা ধাপে ধাপে চলে, এক ধাপ বাদ দিয়া অপর ধাপে উঠা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও ধাপে ধাপে চলিতেছে, বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আমরা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মধ্য স্তর বাদ দিয়া এক লাফে ডবল প্রমোশন নেওয়ার উপায় ছিল না, তাহা সম্ভবপর হইত না। স্বদেশী যুগের ফলেই বিপ্লব যুগ, বিপ্লব যুগের ফলেই সত্যাগ্রহ যুগ, সত্যাগ্রহ যুগের ফলেই অ-সহযোগ যুগ, অ-সহযোগ যুগের ফলেই আইন অমান্য যুগ, এবং আইন অমান্য যুগের ফলেই আগষ্ট বিপ্লব। বিপ্লবের গতি ধাপে ধাপে উপরের দিকে

অগ্রসর হইতেছে। মধ্যের কোন অবস্থাকে বাদ দেওয়া চলেনা, প্রত্যেক অবস্থারই প্রয়োজন ছিল এবং তাহা দেশকে স্বাধীনতার দিকেই আগাইয়া দিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তিও তাহার পূর্ব অবস্থার ফল। জাতির ক্রমবিকাশ এই ভাবেই হয়, একটার সহিত অপরটার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যেমন একটা ক্রমবিকাশ আছে, জাতির চিন্তাধারারও একটা ক্রমবিকাশ আছে। লোকের চিন্তা ধারা সব সময় একরূপ থাকে না, বিভিন্ন যুগের চিন্তাধারা বিভিন্ন রূপ হয়। আদিম যুগের চিন্তাধারা এবং মধ্য যুগের চিন্তাধারা এক নয়, আবার মধ্য যুগের চিন্তাধারার সহিত বর্তমান যুগের চিন্তাধারার অনেক পার্থক্য আছে। ভবিষ্যতেও অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমান চিন্তাধারার পরিবর্তন হইবে। সিপাহী বিপ্লব যুগের চিন্তাধারা এবং স্বদেশী যুগের চিন্তাধারা এক নয়। সিপাহী বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের চিন্তাধারায় ছিল রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। স্বদেশী আন্দোলনের পর, বিপ্লব যুগে, বিপ্লবীদের চিন্তা ধারায় ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। বর্তমান যুগের চিন্তাধারা সমাজতন্ত্রবাদ। বিভিন্ন যুগের চিন্তাধারা এক হয় না। সিপাহী বিপ্লব যুগের চিন্তাধারার বিচার করিতে হইবে সেই যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া। সেই যুগের চিন্তাধারা সেই সময়োপযোগী ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহা চলিতে পারে না। এক সময় যাহা ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, সময়ের ব্যবধানে তাহাই আবার নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। দাসত্ব প্রথা যখন সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন লোকের নিকট তাহা অন্যায় বলিয়া মনে হইত না; কিন্তু বর্তমান যুগে কেহ ইহা কল্পনাও করিতে পারে না।

এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। মানুষের চিন্তাধারার যেরূপ পরিবর্তন হয়, সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বেরও পরিবর্তন হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্ব দেখিতে পাই, বিপ্লব যুগের বিভিন্ন স্তরে আমরা বিভিন্ন নেতা দেখিতে পাই, জাতীয় কংগ্রেসেরও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন নেতার আবির্ভাব হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতেও নূতন নেতা দেখা দিবে। প্রত্যেক নেতারই প্রয়োজন ছিল, তাহারা জাতিকে

স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। যে নেতার নেতৃত্বে ও কর্মীদের সাহায্যে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে, তাহার মূলে থাকিবে পূর্ববর্তী নেতা ও কর্মীদের অবদান। পূর্ববর্তী কর্মীরা স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত না করিয়া দিলে তাহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারিতেন না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস নূতন রূপ ধারণ করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের কল্পনায় দেশের স্বাধীনতা ছিল না, তাঁহারা ছিলেন সংস্কার পন্থী। তাহাদের কল্পনায় ছিল শাসন বিভাগে কিছু ক্ষমতা লাভ এবং সে ক্ষমতা লাভ সংগ্রামের দ্বারা নহে—সহযোগিতা দ্বারা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা ঐতিহাসিক চাহিদা ছিল, তাই জাতীয় কংগ্রেস ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কংগ্রেস আর এক ধাপ অগ্রসর হইল, নেতারা দাবী করিলেন স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। এখন তাহারা শুধু আবেদন নিবেদনের মধ্যে আবদ্ধ রহিলেন না, সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্য ঘোষণা করিলেন, আমাদের দাবী পূরণ না করিলে আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য বর্জন করিব। ইহা জাতীয় কংগ্রেসের সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া অবসাদগ্রস্ত দেশবাসীর আত্মসম্বিত ফিরিয়া আসিয়াছে, দেশবাসী স্বাবলম্বী হইতে শিখিয়াছে।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ভারতের বিপ্লবী দলের পত্তন স্বদেশী আন্দোলনের সময়। ভারতে বিপ্লববাদের ইতিহাসে দেখা যায়, মহারাষ্ট্র দেশে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় এবং বাংলা দেশে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার পি, মিত্র ও পুলিনবিহারী দাস মহাশয় একই সময়ে স্বতন্ত্র ভাবে ভারতে বিপ্লব দল তৈয়ার করার কল্পনা করিয়াছেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে কেহই ইহার বাস্তব রূপ দিতে পারেন নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক সাহেব হত্যার মামলায় চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হয়। তাহার পর সেই দলের নেতৃত্ব ভার সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে আসে। সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে উক্ত বিপ্লব দল দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে কিন্তু নাসিক ষড়যন্ত্রের মামলায় সাভারকার

ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য কর্মীদের ধৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দলের অস্তিত্ব লোপ পায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সমিতির জন্ম হয়। যুগান্তর সমিতির অস্তিত্ব ও আলিপুর বোমার মামলার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায় এবং এক মাত্র অনুশীলন সমিতিই ভারতবর্ষে টিকিয়া থাকে। আলিপুর বোমার মামলা ১৯০৮ সনের মে মাসে হয়। সেই মামলায় শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত উল্লাস কর দত্ত, শ্রীযুক্ত সত্যেন বসু, শ্রীযুক্ত কানাই দত্ত প্রভৃতি বহু লোক অভিযুক্ত হন। যুগান্তর দলের মুখপত্র ছিল যুগান্তর পত্রিকা। যুগান্তর পত্রিকার অস্তিত্ব ১৯০৬ সনের মার্চ মাস হইতে ১৯০৭ সনের জুলাই পর্য্যন্ত ছিল। এই কয় মাসের মধ্যেই যুগান্তর পত্রিকা বাংলা দেশে খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অনুশীলন সমিতির তখন কোন মুখপত্র ছিল না।

অনুশীলনের নেতারা জানিতেন, ভোজবাজির মত ইচ্ছা করিলেই দেশে বিপ্লব হয় না, বিপ্লব শুধু কল্পনার বস্তু নয়, কারখানায় ফরমাইশ দিলেই বিপ্লব তৈয়ার হয় না, বিপ্লবের জন্য চাই বৈপ্লবিক আব-হাওয়া। বৈপ্লবিক আব-হাওয়া সৃষ্টি করিতে না পারিলে শুধু কল্পনা দ্বারা দেশে বিপ্লব আসে না। ঘরে বসিয়া প্রস্তাব পাশ করিলেই বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয় না, বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য চাই বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি। অনুশীলনের কর্মপদ্ধতি প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল এবং সভ্যদের মধ্যেও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন স্তরের ছিল। অনুশীলনের কর্মীরা বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টি, দলের বিস্তারও দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত হইল।

অনেকের ধারণা অনুশীলন সমিতির কোন মতবাদ (ideology) ছিল না। অনেক আধুনিক যুবক বিজ্ঞের মত অনুশীলন সমিতির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। তাহারা জানেনা যে "অনুশীলন" নামের মধ্যেই অনুশীলন সমিতির মতবাদ নিহিত আছে। অনুশীলন পরিকল্পিত সমাজে প্রত্যেক নরনারীর মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে। মানুষের দেহ ও মন লইয়া

মানুষ। মানুষের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশই মনুষ্যত্ব এবং তাহা অনুশীলন দ্বারাই সম্ভবপর। অনুশীলন কল্পিত সমাজে প্রত্যেক মানুষ স্বাস্থ্যবান, নিরোগ, হৃষ্টপুষ্ট, কর্মঠ এবং দীর্ঘায়ু হইবে। প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হইতে হইলে শৈশব হইতে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হইবে এবং ব্যায়াম করিতে হইবে। একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং একজন বাঙ্গালীর মধ্যে দৈহিক পার্থক্যের কারণ শ্বেতাঙ্গগণ শৈশব হইতে পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে। একজন বাঙ্গালী যদি শৈশব হইতে পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করে, স্বাস্থ্যকর স্থানে উত্তম গৃহে বাস করে, তবে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সহিত দৈহিক কোন পার্থক্য থাকিবে না। আমাদের দেশের লোকের দৈহিক অবনতির কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত বাস গৃহের অভাব, স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার অভাব এবং সংযমের অভাব। স্বাস্থ্যবান লোকের দেহে রোগের জীবাণু প্রবেশ করিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে না কিন্তু দুর্বল লোকের দেহে রোগের জীবাণু প্রবেশ করিলে সহজেই তাহাকে শয্যাশায়ী করে। আমাদের দেশে মৃত্যুর হার যে এত অধিক তাহার কারণ শারীরিক দুর্বলতা।

অনুশীলনের মতে শুধু শারীরিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, মানসিক বৃত্তিরও পূর্ণ বিকাশ চাই। অনুশীলন কল্পিত সমাজে প্রত্যেক নরনারী বিদ্বান, চরিত্রবান, সাহসী ও দয়ালু হইবে। ইহা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। অনুশীলন পরিকল্পিত সমাজে নিরক্ষর লোক থাকিতে পারিবেনা, দুর্নীতিপরায়ণ লোক থাকিতে পারিবেনা, চরিত্রহীন, ভীরু লোক থাকিতে পারিবেনা, দরিদ্র থাকিবেনা, অলস লোক থাকিবেনা, স্বাস্থ্যহীন লোক থাকিবেনা। ঐরূপ সমাজ তৈয়ার করিতে হইলে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করিতে হইবে। বৈষম্যের মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। তাই সকল প্রকার বৈষম্য দূর করিতে হইবে। মানব সমাজ হইতে ধন বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, প্রাদেশিক বৈষম্য দূর

করিয়া সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। ইহা এক মাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই সম্ভবপর। পরাধীন অবস্থায় অনুশীলন কল্পিত সমাজ সম্ভবপর নয়, তাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুশীলনের বিদ্রোহ ঘোষণা। অনুশীলন চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।

জাতীয় কংগ্রেস, ১৯২৯ সনে, লাহোর কংগ্রেসে, স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার ৪৫ বৎসর পর জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অনুশীলন জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করার ২৪ বৎসর পূর্বে, স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। জাতীয় কংগ্রেস নেতাগণ যখন স্বাধীনতার কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাহাদের কল্পনায় যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ছিল এবং তাহা পাওয়ার জন্য আবেদন নিবেদন, বিলাতী পণ্য বর্জন বা অহিংস অসহযোগ ছিল কর্মপন্থা, তখন অনুশীলনের নেতাগণ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিল।

পরাধীন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের কোন সহানুভূতি থাকেনা, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও ছিল না। স্বদেশী আন্দোলন যখন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছিল, তখন গভর্ণমেণ্ট তাহা দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য গভর্ণমেণ্ট দমননীতি অবলম্বন করিল, নূতন নূতন আইন জারি করিতে লাগিল। ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, বান্ধব সমিতি, ব্রতী সমিতি, সুহৃদ সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করে এবং পুলিনবাবু প্রভৃতি ৯ জন বিশিষ্ট নেতাকে তিন আইনে নির্বাসিত করে। কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড, লাঠি প্রহার ও নূতন আইনের বলে স্বদেশী আন্দোলন দমন হয়। গভর্ণমেণ্টের দমননীতির ফলে প্রকাশ্য সভা সমিতি বন্ধ হইল, জাতীয় কংগ্রেস নেতারা ভয় পাইয়া নরম সুর ধরিলেন, বারীণবাবু, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বৈপ্লবিক নেতারা জেলে, অনুশীলনের নেতা পুলিনবাবু নির্বাসিত, পি, মিত্র মহাশয়ের পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল,— দেশের মধ্যে দেখা দিল নৈরাশ্য, ভয়, অবসাদ। এখন আর প্রকাশ্য সভা

সমিতি হয় না, পিকেটিং বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কাহারও মুখে আর স্বদেশীর কথা শুনা যায় না, সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ চিন্তায় ব্যস্ত।

সেই দুর্দিনে, অন্ধকার যুগে, অনুশীলন সমিতির কতিপয় তরুণ কর্মী স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর হইল। সেই অন্ধকার যুগে যখন দেশবাসীর মনের মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের কল্যাণের জন্য আছে, এই ধারণাই যখন দেশবাসীর মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল, তখন আমরা, তরুণ বিপ্লবীরা, ভারতবর্ষকে সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা স্বাধীন করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। তখন আমাদের বয়স কত ছিল? আমাদের বয়স তখন ১৮ হইতে ২৪এর মধ্যে ছিল। আমরা বিদ্বান ছিলাম না, আমাদের টাকা পয়সা ছিল না, পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের ছিলনা, লোক সমাজে ছিলাম আমরা অপরিচিত। তবে আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল, আমাদের মধ্যে ভয় ছিলনা, স্বার্থভাব ছিলনা, আমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ছিল, আমাদের মধ্যে একতা ছিল। আমরা তাহাই সম্বল করিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়ি। আস্তে আস্তে বিপ্লব দল সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল।

স্বদেশ প্রেমিকের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কোন শক্তিই দমন করিতে পারেনা। কোন বাধা বিঘ্ন তাহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারে না। অত্যাচার, নির্যাতন, অভাব অনটন তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। নিরাশা তাহাদের মনকে দুর্বল করিতে পারে না। অনুশীলনের তরুণ কর্মীরা অন্ধকার পথে, নিরাশার মধ্য দিয়া, গীতার নিষ্কাম-কর্ম-যোগের সাধনায় ব্রতী হইল। সেই ঘোর দুর্যোগের দিনে তাহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় ঝাপ্টা বহিয়া গিয়াছে, কতদিন তাহারা অনাহারে রহিয়াছে, কত বিনিদ্র রজনী তাহারা যাপন করিয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। তখন ফুলের মালা, বাহবা দ্বারা তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করার কেহ ছিলনা, কেহ তাহাদিগকে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করিত না—তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিত পুলিশ লাঠি দ্বারা, লোকের ভর্ৎসনা শুনিয়াই তাহারা হইত পরিতৃপ্ত। মহৎ কাজে বাধা বিঘ্ন অনেক

থাকে, যাহারা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে তাহারাই হয় জয়ী। তরুণ বিপ্লবীরা সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐই সব নীরব নির্ভীক কর্মীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে দেশের যুবক সম্প্রদায়ের প্রাণে নূতন সাড়া পড়িল।

স্রোতস্বিনীর স্রোত প্রবাহ বাঁধ দ্বারা আটকানো যায় না, জলধারা কোন না কোন পথে প্রবাহিত হইবেই। জলের প্রবাহের গতি যদি রুদ্ধ হয়, তবে জলরাশি ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া বন্যার আকারে দেখা দিবে, সেই বন্যায় বাঁধ যাইবে ভাঙ্গিয়া, কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারিবেনা। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাই হয়। একটা জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমননীতি দ্বারা সাময়িক ভাবে দমন করা যায় কিন্তু চিরতরে লোপ করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট দমননীতি দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন দমন করিয়াছে, সভা সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, প্রকাশ্য ভাবে কিছু করার উপায় নাই। তরুণ বিপ্লবীরা যখন দেখিল প্রকাশ্য ভাবে চলার পথ রুদ্ধ, তখন তাহারা গুপ্ত পথ অবলম্বন করিল ; তাহাদের কর্ম প্রবাহ গুপ্ত পথেই চলিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টের দমননীতি অনুশীলন সমিতিকে গুপ্ত সমিতিতে পরিণত করিতে বাধ্য করিয়াছে, —প্রকাশ্য অনুশীলন সমিতি এখন গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অনুশীলনের তরুণ নেতারা বহু নীরব কর্মী বাছাই করিয়া, তাহাদিগকে বাড়ীঘর ছাড়াইয়া, গ্রামে গ্রামে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করিয়া দিল। ঐ সব নীরব কর্মীরা পাঠশালার শিক্ষক বা গৃহ শিক্ষক ভাবে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারও সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী প্রচার করিতে লাগিল। এই ভাবে দল পুষ্ট হইতে লাগিল। এই সব কাজ গোপনে পুলিশের তীব্র দৃষ্টি এড়াইয়া করিতে হইত। সময় সময় পুলিশ এই সব লোকের সন্ধান পাইয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাহাদিগকে ১০৯।১১০ ধারায় জেল খাটিতে হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় চরম পন্থী সংবাদ পত্র ছিল, তাহা দ্বারা দেশের মধ্যে প্রচার কার্য চলিত। সরকারের দমন নীতির ফলে যুগান্তর, সন্ধ্যা,

বন্দেমাতরম প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তরুণ বিপ্লবীরা তাহার খুব অভাব অনুভব করিতে লাগিল। প্রকাশ্য ভাবে তাহাদের সংবাদ পত্র বাহির করার কোন উপায় ছিলনা।

সঙ্গীত, সংবাদ পত্র ও সাহিত্য জাতির মধ্যে নবজীবন আনে। এই ত্রি-শক্তি রাজনীতির ক্ষেত্র সতেজ রাখে। এই ত্রি-শক্তির প্রভাবে দেশবাসীর মনের মধ্যে এরূপ আগুন জ্বলে যে রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতাদের একটী একটী করিয়া কর্মী কুড়াইয়া লইতে হয় না, দলে দলে লোক স্বেচ্ছায় রাজনীতি ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কোন স্বাধীন দেশ যদি অপর কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চায়, তবে লেখকগণ প্রথমে জমি তৈয়ার করেন। তাঁহারা এরূপ লেখনী চালান, যার ফলে দেশবাসী সেই জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য অধীর হইয়া উঠে। যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দেয়, তার মূলে থাকে লেখকদের লেখনী, বক্তাদের বক্তৃতা, চারণদের প্রচার। লেখকদের লেখনী, বক্তাদের বক্তৃতা, চারণদের সঙ্গীত প্রভাবে দেশের জনগণের ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহারা তখন স্থির থাকিতে পারেনা, তাহারা লাফাইয়া উঠে, ঝাঁপাইয়া পড়ে, প্রাণ রক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকেনা। সংবাদ পত্র, সাহিত্য ও সঙ্গীত জাতির মনের গতি পরিবর্তন করিয়া দেয়।

অনুশীলন সমিতির কর্মীরা গোপনে দুইখানা সংবাদপত্র বাহির করিতে লাগিল, একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরেজী। বাংলা পত্রিকার নাম 'স্বাধীন ভারত' ইংরেজীখানার নাম ছিল 'লিবার্টি'। তাহাদের গোপন ছাপাখানায় তাহারা গোপনে কাগজ ছাপাইত। পত্রিকা ছিল সাময়িক, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট তারিখে তাহা বাহির হইত না। পত্রিকা যখন বাহির হইত তখন কোন এক নির্দিষ্ট তারিখেই পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ তাহা প্রকাশ পাইত। স্কুল কলেজে, আইন আদালত গৃহে, রাস্তার দেওয়ালে, হোষ্টেলে ছাত্রদের টেবিলের উপর, বিভিন্ন স্থানে তাহা দেখা দিত। কেহ কেহ ডাক যোগেও পাইতেন। স্বাধীন ভারত ও লিবার্টি যখন প্রকাশ হইত তখন পুলিশের কর্মতৎপরতা বাড়িয়া যাইত। পুলিশ বহুস্থানে খানাতল্লাশ করিত, বহুলোককে ধরিয়া টানাহেঁচড়া করিত।

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, তাহারা লেখাপড়া জানিত না, কতকগুলি অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকের দল, শুধু খুন ড়াকাতি করিত। বিপ্লবীরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ছিল না, ইহা অতি সত্য কথা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহাদের বয়স অল্প ছিল, তাহারা স্কুল কলেজ ছাড়িয়া বিপ্লব দলে যোগ দিয়াছে, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া স্বাধীনতার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভের জন্য ধাবিত হয় নাই। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের পর দেশের স্বাধীনতার কাজে নিযুক্ত হইবে স্থির করিয়াছিল, তাহা-দিগকে আর কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। বিপ্লবীদের মধ্যে যাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও, তার অর্থ এই নয় যে তাহারা অশিক্ষিত ছিল। ষ্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনী কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী নহেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় এমন অনেক নামকরা লোক আছেন যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী লাভ করেন নাই। আমাদের দেশের লোকের অবশ্যই ডিগ্রির একটা মোহ আছে, যাহার ডিগ্রি নাই তাহার কথা কেহ শুনিতে চায় না। যাহারা 'স্বাধীন ভারত' বা 'লিবার্টি' পড়িয়াছেন, তাহারা বলিবেন না যে বিপ্লবীরা অশিক্ষিত ছিল। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করে নাই এরূপ অনেক বিপ্লবী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী লোকদিগকে যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া বিপ্লব দলে আনিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইলেই যে রাজনীতি ক্ষেত্রেও ডিগ্রী পাইবে তাহা নহে। রাজনীতি ক্ষেত্রের ডিগ্রী আলাদা। একজন এম, এ, পাশ করিয়া যদি বলে, যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছি, আমি এখন ডাক্তারী করিব,—ইহা দ্বারা তাহার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। ডাক্তারী করিতে হইলে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে, তবেই সে ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হইতে পারিবে। ইহা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, সকলেই বড় ডাক্তার হইতে পারে না। যে যে ব্যবসা করিবে, তাহার সেই ব্যবসা

সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। এম, এ, পাশ করিলেই বড় ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের সেই কাজের উপযোগী জ্ঞান থাকা চাই। বিপ্লবীদের কাজ চালানোর মত জ্ঞান ছিল।

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, তাহারা সন্ত্রাসবাদী ছিল, অর্থাৎ তাহারা বিশ্বাস করিত পুলিস বা সাহেব খুন করিলেই দেশের স্বাধীনতা আসিবে। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে যাহারা এরূপ ধারণা করে, তাহারা নিজেদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করে। যাঁহারা আমাদিগকে সন্ত্রাসবাদী বলেন, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষে কে প্রথম সন্ত্রাসবাদ প্রবর্তন করিয়াছে? বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শঠতা-কপটতা-বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা, অন্যায় ভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া সন্ত্রাসবাদ দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ করিয়াছে না কি? কোন্ অধিকার বলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় বসিয়া আছে? একটা শান্তিপ্রিয় জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারের পর তাহাদের অসহায় অবস্থায় তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? রাজনৈতিক বন্দীদের জেলখানায় মারপিট করা, তাদের উপর লাঠি চার্জ করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইয়া তাহাদিগকে পশুর ন্যায় হত্যা করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? কোন্ অধিকার বলে বিদেশী সরকার আমাদের দেশবাসীকে হত্যা করে? গভর্ণমেণ্টের টেররিজমের ফলে যখন দেশবাসীর মধ্যে ডিমরেলিজেসন আসিয়াছিল তখন আমরা বিপ্লবীরা কাউণ্টার টেররিজম চালাইয়াছি। আমরা টেররিজম চালাইয়াছি দেশবাসীকে এই আশ্বাস দেওয়ার জন্য,—অত্যাচারীর শাস্তিবিধানের লোক এদেশেই আছে। আমরা টেররিজম চালাইয়াছি, গভর্ণমেণ্টকে জানানোর জন্য—অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া হইবে, এক-তরফা কিছুই চলিবে না। আমরা সফল মনোরথ হইয়াছি, আস্তে আস্তে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছে।

বিপ্লবদল যখন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতে লাগিল, তখন গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ প্রচার করিতে লাগিল, বিপ্লবীরা বিপথগামী, তাহারা সন্ত্রাসবাদী।

বৃটিশের প্রচার বিভাগ জনসাধারণের নিকট বিপ্লবীদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এরূপ প্রচার করিত এবং আমাদের দেশী লোক, এমনকি স্বদেশী নেতা ও দেশী খবরের কাগজওয়ালারাও অনেকে তাহা বেদবাক্য বলিয়া মনে করিত। বিপ্লবীরা যে দেশের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি না করিয়াছিল তা নয়, তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে—প্রয়োজন হইতে এবং তাহা সময়োচিত ছিল। তাহারা জানিত ইহাই শেষ নয়। বিপ্লবীরা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়িয়াছে, বিপ্লবের বিফলতার কারণও তাহারা জানিত। বিপ্লবীদের ভাবী বিপ্লব সম্বন্ধে একটা কল্পনা ছিল এবং সেই কল্পনা অনুযায়ী তাহারা কাজ করিয়া যাইতে ছিল। কর্মক্ষেত্রে তাহারা নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, কাজের মধ্য দিয়াই তাহারা ভাবী কাজের উপযোগী হইয়াছে।

বিপ্লবীরা সেই অন্ধকার যুগে ভারতবর্ষে নব জাগরণ আনিয়াছে, ভারতবাসীর মধ্যে তাহারা নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে। বাংলার বিপ্লবীরা "ভীরু বাঙ্গালী" এই কলঙ্ক দূর করিয়াছে। এক সময়ে বাঙ্গালীদিগকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা ভীরু বাঙ্গালী বলিয়া ঘৃণা করিত, কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনের পর আর কেহ এ কথা বলিতে সাহস করে নাই যে বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী মরিতে জানে না। বাংলার বিপ্লবীরা প্রমাণ করিয়াছে বাঙ্গালী ভীরু নয়, বাঙ্গালী লড়াই করিতে পারে, প্রাণ দিতে পারে। বাংলার বিপ্লবীরা পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন দেশের বীর সৈনিকদের সমকক্ষ ছিল। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিতেছি। বিপ্লবীদের অধিকাংশ ছিল বাড়ী ঘর ছাড়া, পুলিশ তাহাদের অনুসন্ধান করিত, তাহারা নাম গোপন করিয়া চলিত। একবার ঢাকা সহরের কলতাবাজার গলিতে কয়েকটী বিপ্লবী একটী ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। পুলিশ তাহাদের সন্ধান পাইয়া একদিন শেষ রাত্রে সেই বাড়ী ঘেরাও করিল। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং বহু বন্দুকধারী পুলিশসহ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের একটী খণ্ডযুদ্ধ হয়। ভোর সময় পুলিশ একটী বিপ্লবীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোড়ে, ভিতর হইতে

গুলির আওয়াজ দ্বারাই প্রত্যুত্তর আসে। দুই পক্ষে কিছুক্ষণ গুলি চলিতে থাকে, অবশেষে বাড়ীর ভিতর হইতে গুলির আওয়াজ বন্ধ হয়। পুলিশ তখন সেই বাড়ী অধিকার করিয়া দেখিল, দুইটী যুবক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে একটী পিস্তল। পুলিশ পক্ষেও অনেক আহত হইয়াছিল। যুবক দুইটীর সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত, সর্বাঙ্গ রুধিরাক্ত মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। পুলিশ তাহাদের নাম জানিত না, পুলিশ তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের নাম বলিল না। পুলিশ তাহাদের নাম জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, ভয় দেখাইল, প্রলোভন দেখাইল অবশেষে তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, কিন্তু তাহারা নিজের নামটী পর্যন্ত বলিল না। সেখানেই তাদের মৃত্যু হইল। সেই বীর বিপ্লবীদ্বয় মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্তেও প্রলোভনকে উপেক্ষা করিয়াছে, অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহারা ভয়ে ভীত হয় নাই, মৃত্যুর সময় শুধু এই কথাই বলিয়াছিল "শান্তিতে মরিতেও দিবে না।" তারা নিজের নামটী পর্যন্ত বলিয়া গেল না। পুলিশ অবশেষে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, তাহাদের একটী কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা ৺বসন্ত মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র তারিণী মজুমদার, অপরটী মুর্শিদাবাদের নলিনী বাগ্চী। যে বাংলার যুবক, তারিণী-নলিনী এতটা বীরত্ব দেখাইয়াছে সে জন্য বাংলাদেশ গর্ব করিতে পারে না কি? যদি কোন স্বাধীন দেশের যুবক এরূপ বীরত্ব দেখাইত, তবে তাহাদের নামে কত কবিতা লেখা হইত এবং সেই কবিতা পড়িয়া দেশের তরুণের দল অনুপ্রাণিত হইত। দেশের লোক জানে তারিণী-নলিনী বিপথগামী, তারিণী-নলিনী সন্ত্রাসবাদী কিন্তু আমি জানি তারিণী-নলিনী বিপথগামী নয়, তারিণী-নলিনী বিপ্লবী, তারিণী-নলিনী দেশপ্রেমিক। তারিণী-নলিনী জানিত, দেশের লোক তাহাদের বিপথগামী বলিয়া গালি দিবে, তবু তাহারা করিয়া যাইবে তাহাদের কর্তব্য। তারিণী-নলিনী জানিত পরাধীন দেশে দেশপ্রেমের ইহাই পুরস্কার।

বিপ্লবীদের জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়, তাহারা অনেক দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছে, অনেক প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের নাম

কেহ জানে না, জানিতে পারিবেও না। পরাধীন দেশে বিপ্লবদলের বা বিপ্লবীদের ইতিহাস লেখা চলে না, স্বাধীন দেশ হইলে তাহাদের নামে উপন্যাস, নাটক রচিত হইত। অন্ধকার যুগে যাহারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া দিন রাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে, তাহারা লোক সমাজে অজ্ঞাতই থাকে। তাহাদিগকে কেহ চিনে না, তাহাদের কথা কেহ স্মরণ করে না, তাহারা জনসমাজে অস্পৃশ্যই থাকিয়া যায়। আধুনিক লোকেরা মনে করে তাহারা অজ্ঞ ছিল, অশিক্ষিত ছিল, অকর্মণ্য ছিল, ভীরু ছিল। আমাদের ভাবী বংশধরগণও আমাদের সম্বন্ধে এই কথাই হয়তো বলিবে। যাহারা এরূপ উক্তি করে তাহারা জানে না বর্তমান অতীতেরই ফল।

বিপ্লবীরা ছিল নীরব কর্মী, তাহারা গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনাই করিয়া আসিয়াছে, নাম যশের দিকে যায় নাই। তাহারা অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়াই শিখিয়াছে, নাম যশ বা নেতৃত্ব স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিতে হইবে, নেতার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিতে হইবে। ইউরোপের ডিমক্র্যাসীর ধাক্কা তাহাদের গায়ে লাগে নাই, উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাহারা ছিল চরিত্রবাণ। তাহাদের ধারণায় চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল লোক দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে না, তাই তাহারা চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখার চেষ্টা করিত, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা মানিয়া চলিত। চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল লোকদের বিপ্লবদলে কোন স্থান ছিল না।

অনুশীলন সমিতির কাঠামোর সহিত রুশিয়ার বলশেভিক পার্টির অনেকটা মিল আছে। বলশেভিক পার্টির কাঠাম ও গঠন সম্বন্ধে লেনিন বলিয়াছেন, —পার্টির দুইটী অংশ থাকিবে। (ক) পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের লইয়া একটী ঘনিষ্ঠ চক্র হইবে। যাহারা পেশাদার বিপ্লবী অর্থাৎ যাহারা পার্টির কাজ ছাড়া আর কিছু করে না এবং যতটুকু থাকা দরকার অন্ততঃ ততটুকু মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে, সংগঠনের

অভ্যাস এবং পুলিশের সহিত পাল্লা দেওয়া ও এড়াইয়া যাওয়ার দক্ষতা রাখে এরূপ লোক লইয়া ঘনিষ্ঠ চক্র গঠন করিতে হইবে। (খ) জাল বুনানি, শ্রমব্যস্ত লক্ষ লক্ষ জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেন এরূপ বহু সংখ্যক পার্টির সভ্য থাকিবে। এই দলের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল জার শাসনের উচ্ছেদ করা। তাহারা জানিতেন জার শাসনের উচ্ছেদ না হইলে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে না।

অনুশীলন সমিতির সভ্যও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বাড়ীঘর ছাড়া সভ্য এবং গৃহী সভ্য। সমিতির সভ্যদিগকে যোগ্যতা অনুসারে আদ্য, মধ্য ও অন্ত 'প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। আজকাল দলাদলি ও প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন লোক, এমনকি পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের লোকও অনায়াসে দলের সভ্য হইতে পারে, কোন বাছ বিচার নাই, কিন্তু সেই যুগে কেহ ইচ্ছা করিলেই দলের সভ্য হইতে পারিত না। তখন সমিতির সভ্য হইতে হইলে তাহাকে বহুদিন অস্থায়ী সভ্য হিসাবে থাকিতে হইত। যাহাকে দলের সভ্য করা হইবে তাহার স্বাস্থ্য ও চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত, বিভিন্ন পুস্তক পাঠ ও উপদেশ দ্বারা তাহার মন গঠন করা হইত এবং ছোট খাট কাজের মধ্য দিয়া তাহার পরীক্ষা হইত। নূতন সভ্যকে অন্তত: ছয় মাস শিক্ষাধীনে থাকিতে হইত। স্থানীয় নেতা যখন মনে করিতেন উক্ত ছেলেটী দলের সভ্য হওয়ার উপযুক্ত হইয়াছে তখন তাহাকে আদ্য প্রতিজ্ঞা করান হইত। তখনও সে দলের পূর্ণ সভ্য নয়। যাহারা অন্ত প্রতিজ্ঞা করিত তাহারাই দলের প্রকৃত সভ্য বলিয়া গণ্য হইত। বাড়ীঘর ছাড়া সভ্য সকলেই অন্ত প্রতিজ্ঞার অধিকারী ছিল।

গৃহী সভ্যদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম শ্রেণীর গৃহী সভ্যদিগকে আশা করা যাইত তাহারা সর্বদা বাড়ীঘর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত। এই শ্রেণীর সভ্য প্রয়োজন হইলে যে কোন মুহূর্তে বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিবে, সকল প্রকার বিপজ্জনক কাজের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, বাড়ীতে থাকিয়াই বাড়ীঘর ছাড়া সভ্যের ন্যায় সকল প্রকার কাজ করিবে। দ্বিতীয় স্তরের

সভ্যরা বেশী বিপদের সম্মুখীন না হইয়া দলের কাজ করিত ও যথাসম্ভব সাহায্য করিত। ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলার পর সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিয়মাবলী উঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ তাহা ষড়যন্ত্রের দলিল হিসাবে সরকার পক্ষ ব্যবহার করিত।

সমিতির সভ্যদিগকে অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। প্রথম পরীক্ষা বাড়ীঘর ছাড়া, দ্বিতীয় পরীক্ষা গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কার্য দ্বারা দক্ষতার পরিচয় দেওয়া, তৃতীয়,—বিপজ্জনক কাজের সম্মুখীন হওয়া, চতুর্থ—একবার জেল খাটিয়া, পুলিশের অত্যাচার ও জেলের নির্যাতন ভোগ করিয়া, আবার বাড়ীঘর ছাড়িয়া দলের কাজে নিযুক্ত হওয়া। যাহারা এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, যাহারা বহু দিন যাবৎ কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া, বহু আপদ বিপদের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, যাহারা বীরত্ব-আত্মত্যাগ ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহারাই দলের সভ্যদের নিকট নেতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতেন। অনুশীলনের প্রত্যেক নেতাই ছোট হইতে দক্ষতার পরিচয় দিয়া বড় হইয়াছে। কাজের মধ্য দিয়া যাহারা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহারা আস্তে আস্তে গ্রাম হইতে প্রধান কেন্দ্রে আসিয়াছে। আমরা সকলেই গ্রামে থাকিয়া, পলাতক অবস্থায়, কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি। অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগকে ধাপে ধাপে উচ্চ স্তরে উঠিতে হইত। সমিতির সভ্য হইয়াই কেহ বড় বড় কথা বলিয়া, নেতাদের নিন্দা করিয়া, নিজে নেতা হওয়ার দাবী করিতে পারিত না।

অনুশীলনের নেতা ভোটে স্থির হইত না। কোন ধূর্ত লোক ষড়যন্ত্র করিয়া ভোট বাগাইয়া নেতা হইতে পারিত না। অনুশীলনের নেতা হওয়া ধন বা বিদ্যার উপর নির্ভর করিত না। অমুক বড় লোক বা বিদ্বান, তাহাকে নেতা করিতে হইবে, অনুশীলনের সভ্যদের সে ধারণা ছিল না। অনুশীলনের নেতা স্বাভাবিক গতিতে তৈয়ার হইত, হঠাৎ কেহ নেতা হইতে পারিত না। অনুশীলনের গঠন প্রণালী এরূপ ছিল এবং সভ্যদের মধ্যে এরূপ জমাট ভাব ছিল যে তখন নেতৃত্বের কোন প্রশ্ন উঠে নাই, নেতৃত্বের কোন প্রতি-যোগিতাও ছিল না। সেই যুগে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত প্রাধান্যই বড়

ছিলনা, দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নই বড় ছিল, তাই নেতৃত্বের প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। সকলেই কাজ করিয়াছে, কাজের কথা ভাবিয়াছে; আমরা সকলে এক, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিব, পরস্পরকে সাহায্য করিব, এই ধারণাই সকলের মনে স্থান পাইত। তখন পুলিশের গুপ্ত চর বিভাগ এতটা উন্নত ছিল না, দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কেহ ছিল না, যদি কেহ বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিত তবে তাহার শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। কোন বিপ্লব দলের মধ্যে যদি দলাদলি থাকে, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা না থাকে, তবে সেই দল টিকিয়া থাকিতে পারেনা। অনুশীলনের মধ্যে দলাদলি ছিলনা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ছিল, তাই অনুশীলন সমিতি এত বড় হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

পুলিন বাবুর পর দলের কোন নির্দিষ্ট নেতা ছিলনা, কোন ইলেকসনের ব্যবস্থা ছিলনা, যাহারা দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ চক্র ছিল, তাহারাই পরামর্শ করিয়া দলের কাজ চালাইতেন। কেহ ধৃত হইলে পরবর্ত্তী লোক স্বাভাবিক গতিতেই তাহার স্থান পূরণ করিত। সমিতির নেতৃস্থানীয় সভ্যদের মধ্যে সকলেই যে পরামর্শ সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেন তাহা নহে, কারণ বিভিন্ন সভ্য বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, সব সময় একত্র হওয়া সম্ভবপর হইত না। কোন বিশেষ পরামর্শের প্রয়োজন হইলে নিকটে যাহারা থাকিতেন তাহারাই পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেন। সমিতির প্রত্যেক সভ্যেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সহিত আলাপ আলোচনা করার অধিকার ছিল। কোন সাধারণ সভ্য বা গৃহী সভ্য যদি কোন নূতন প্রস্তাব করিতেন তবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইত। তখন ছিল সহযোগিতা—প্রতিযোগিতা ছিল না।

আজকাল আধুনিক সভ্যদের মধ্যে ইলেক্‌সন, ডিমক্র্যাটিক সেণ্ট্রালিজম প্রভৃতি রব উঠিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে সব সভ্য অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নাই বা ভবিষ্যতেও হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কোন পরিচয় দিতে পারে নাই, যাহারা দলের বিশেষ

কোন কাজ করে নাই, তাহারাই মাতিয়া উঠিতেছে। বিপ্লব দলে ইলেকসন চলিতে পারে না। বিপ্লব দলে ইলেকসন প্রথা প্রবর্তন করার অর্থ সরকারের আই, বি, আফিসের সুবিধা করিয়া দেওয়া। সরকার পক্ষ চায় বিপ্লব দলের কার্য্য নির্বাহক সমিতিতে তাহাদের কিছু লোক রাখিতে। বিপ্লব দলের কার্য্য নির্বাহক সমিতিতে সরকারের লোক রাখিতে পারিলে সরকার পক্ষ সেই দল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। তাহা হইলে সরকার যে শুধু দলের সকল সংবাদ পাইবে তা নয়, বিপ্লব পণ্ড করারও সুবিধা হইবে। কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হইলে দলের লোকের উপর একটা প্রভাব থাকে। সরকারের লোক কার্য্য নির্বাহক সমিতির সভ্য হইলে সে তাহার প্রভাব সরকারের কাজে লাগাইতে পারিবে। ইলেকসনের ব্যবস্থা থাকিলে সরকার কতকগুলি তরুণ গুপ্তচরকে দলের সভ্য করাইয়া অনায়াসে সেই দলের কার্য্যনির্বাহক সমিতি দখল করিয়া লইতে পারিবে। অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ চক্র দখল করার কোন সুযোগ সরকার পক্ষ পায় নাই।

বর্তমান যুগে দেখা যায় ইলেকসনের মধ্যে দুর্নীতি ভরপুর, কোন উপযুক্ত লোক নির্বাচিত হইতে পারে না, যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া অধিক ভোট সংগ্রহ করিতে পারে তাহারাই নির্বাচিত হইতে পারে। এই ইলেকসনের মধ্যে থাকে দুর্নীতি, প্রতিযোগিতা এবং তাহার ফলে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। বিদেশী সরকারের অধীনে থাকা পর্যন্ত বিপ্লব দলে ইলেকসন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত নয়। অবশ্যই দেশ যখন স্বাধীন হইবে তখন গণভোটে দেশ শাসিত হইবে, তখন ডিক্টেটারী শাসন উচিত নয়—তাহা যে নামেই হউক না কেন। অনুশীলন সমিতির নেতাদের মধ্যে যখন দুর্বলতা আসিয়াছে তখন তাহারা নিজ হইতেই সরিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে সরানোর কোন প্রয়োজন হয় নাই। তখন নেতা হওয়া লাভজনক ব্যবসা ছিল না, নেতাদের ফাঁসি, দ্বীপান্তর বা গুলির আঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনাই ছিল অধিক।

বর্তমানে পৃথিবীর কোথায়ও ডিমক্র্যাসী নাই, সর্বত্রই ডিমক্র্যাসীর নামে প্রতারণা চলিতেছে, জনগণ প্রতারিত হইতেছে। বর্তমানে প্রকৃত ডিমক্র্যাসী

ইংলণ্ডেও নাই, আমেরিকাতেও নাই, রুশিয়াতেও নাই। পূর্বে রুশিয়াতে বলশেভিক পার্টির মধ্যে সেণ্ট্রালিজম ছিল কিন্তু ডিমক্র্যাসী ছিল না। দেশ শিক্ষিত ও উন্নত না হইলে ডিমক্র্যাসীর কোন অর্থ হয় না। দেশের জনগণ যখন শিক্ষিত হইবে, যখন তাহাদের আত্মচেতনা জাগিবে, যখন তাহাদের মধ্য হইতে দুর্নীতি দূর হইবে, কর্তব্যজ্ঞান জাগিবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থই বড় হইবে, তখনই জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিবে, তখনই দেশে প্রকৃত ডিমক্র্যাসী আসিবে।

অনুশীলন সমিতির সভ্য কেহ ইচ্ছা করিলেই যেমন হইতে পারিত না, আবার কেহ ইচ্ছা করিলেই দল ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। বিপ্লব দলের সভ্য স্থায়ী সভ্য—আজীবন সভ্য। কেহ একবার বিপ্লব দলের সভ্য হইলে মৃত্যু না হওয়া পর্যান্ত দল ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। বিপ্লব দলের সভ্যের অনেক গোপনীয় বিষয় জানা থাকে এবং সে দল ছাড়িয়া গেলে অনেক অনিষ্ট করিতে পারে, তাই কেহ দল ছাড়িতে পারিত না। অনুশীলন সমিতির নিয়মাবলীতে ছিল, যদি কেহ দল পরিত্যাগ করে তবে তাহার জ্ঞান লোপ করিতে হইবে। অবশ্যই অবস্থা বিশেষে যে কোন সভ্য দল পরিত্যাগ করিয়া, গৃহী সভ্য হিসাবে থাকিতে পারিত; কিন্তু দলত্যাগ করিয়া দলের ক্ষতি বা বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

বিপ্লব যুগ ছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের যুগ। তখন সকলকে নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া কাজ করিতে হইত। তাঁহারা জানিতেন ধৃত হইলে তাঁহাদের হয় ফাঁসি হইবে, নয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইবে, অথবা বন্দুকের গুলির আঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে। তখন বিপ্লবীদের সম্মুখে লোভনীয় কিছুই ছিল না—কাউন্সিল, কর্পোরেশন ছিল না, ফুলের মালাও ছিল না। অবশ্যই তাহারা জানিত, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সরকার হইতে তাহাদের অর্থ ও চাকুরী লাভ হইবে কিন্তু তাহাতেও নিশ্চয় মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। বিপ্লবীদের প্রাণে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন দুর্বলতা, নীচতা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ স্থান পায় নাই। অবশ্যই সময় সময় যে

ইহার ব্যতিক্রম না হইয়াছে তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে এবং তাহাদের কেহ কেহ চরম দণ্ড ভোগ করিয়াছে, অবশিষ্টদের লোকালয়ের বাহিরেই নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। বিপ্লব দলের সভ্যদিগকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইত, এজন্য দলে সরকারের গুপ্তচর বিভাগের কোন প্রভাব ছিল না। তখন প্রলোভনের কিছু না থাকায় এবং নিশ্চয় মৃত্যু জানায় দলাদলি ছিল না। অবশ্যই কেহ কেহ মতবাদের দোহাই দিয়া দল ছাড়ার চেষ্টা করিয়াছে।

অনুশীলন সমিতির পিছনে আছে একটা মস্তবড় গৌরবময় ইতিহাস, তাহা হইতেছে বীরত্ব-আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ইতিহাস। স্বদেশী আন্দোলন যখন ব্যর্থ হইল, গভর্ণমেণ্ট যখন দমননীতি চালাইতে লাগিল, তখন আন্দোলনের নেতারা ভয়ে পিছনে পড়িলেন, দেশের মধ্যে দেখা দিল নৈরাশ্য-ভয়-অবসাদ। সেই দুর্যোগে অনুশীলনের তরুণ বিপ্লবীরা কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িল, তাহাদের বীরত্ব-আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ফলে দেশ সজীব হইল, দেশবাসীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল। অনুশীলন সমিতি ছিল সর্বভারতীয় দল। এক সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দল বলিতে বিপ্লব দলকেই বুঝাইত। কোন কোন বিদেশী গভর্ণমেণ্ট, তাহার শত্রু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাহিলে, তাহারা ভারতের বিপ্লব দলকে তাহাদের সহযোগী হিসাবে পাইবে বলিয়া আশা করিত।

অন্ধকার পথে চলিতে সাধারণতঃ কাহারও কোন উৎসাহ থাকে না, যে পথে বাধাবিঘ্ন অধিক, ভবিষ্যতে উন্নতির কোন আশা নাই, সেই পথে কেহ চলিতে চায় না। যেখানে লাভের আশা আছে, ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে, লোক সে দিকেই ধাবিত হয়। বিপ্লব যুগে, অন্ধকার পথে, বিপদের বোঝা মাথায় করিয়া, নিরাশার মধ্য দিয়া চলিতে হইত, তাই দেশের প্রতিভাশালী বিদ্বান, চিন্তাশীল বুদ্ধিমান বা বড়লোকের দল এই পথে আসিতেন না, বরং এই পথের নিন্দা করিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন। তখন জাতীয় কংগ্রেস নেতারা কোন আপদ বিপদের সম্মুখীন না হইয়া আবেদন-নিবেদন

লইয়াই সাধারণতঃ ব্যস্ত থাকিতেন। বিপ্লব আন্দোলনের ফলে যখন বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইল, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম আসিল তখন অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। তখন লাভের আশায় বহু লোক রাজনীতিক্ষেত্রে ভিড় করিল। যাহাদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ফলে রাজনৈতিক অধিকার আসিল, তাহারা সেই সব সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহারা দেশবাসীর নিকট সন্ত্রাসবাদী বলিয়াই গণ্য হইল।

বিপ্লবীরা লাভের প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নাই, সে ভাবে তাহারা অভ্যস্ত ছিল না, তাহারা জানিত বন্দুকের গুলিতে তাহাদের মৃত্যু হইবে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডভোগ করিতে হইবে—ফুলের মালা, কাউন্সিল-কর্পোরেশনের সভ্য হওয়া তাহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাহারা প্রকাশ্যভাবে চলাফিরা করিত না, তাহা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। তাহারা প্রকাশ্য সভা সমিতিতে যাইত না, বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস তাহাদের ছিল না, তাহারা আত্মগোপন করিয়াই চলিত, এজন্য তাহারা জনসমাজে অপরিচিতই ছিল। বিপ্লবীরা যথাসম্ভব নিজ নাম গোপন করিয়াই চলিত। এমন দৃষ্টান্তও আছে—পুলিশের গুলিতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, সর্বাঙ্গ রুধির লিপ্ত, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, পুলিশ নাম জানার জন্য উত্ত্যক্ত করিতেছে, সে এই মাত্র বলিল, "আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও, বিরক্ত করিও না"। সে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল, নিজের নামটুকু পর্যন্ত বলিয়া গেল না।

বিপ্লবীরা গুপ্ত আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে, প্রকাশ্য আন্দোলন চালানের জন্য যে সব গুণাবলির প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে তাহার অভাব ছিল। প্রকাশ্য আন্দোলনের জন্য বক্তা, লেখক ও প্রচারকের প্রয়োজন। বিপ্লবীদের মধ্যে বক্তা কেহ ছিল না, কাজেই জনসাধারণের মধ্যে তাহারা পরিচিত ছিল না। তাহাদের প্রকাশ্য কোন সংবাদপত্র ছিল না, লেখক অবশ্যই কিছু ছিল কিন্তু সেই সব লেখকদের নাম কেহ জানিত না। তাহাদের প্রচার বিভাগ ছিল আদর্শ প্রচারের জন্য, নিজেকে দেশবাসীর সম্মুখে বড় করিয়া প্রচার করার জন্য নয়। নূতন শাসন সংস্কার যুগে যখন কাউন্সিল-কর্পোরেশনের দরজা খুলিয়া গেল তখন

বহু বিদ্বান-বুদ্ধিমান-বড়লোক রাজনীতিক্ষেত্রে ভিড় করিল। তাহারা সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিলেন, তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইল, আশ্বস্ত হইল, তাহারা মনে করিল এত দিনে আমাদের দুঃখের অবসান হইবে।

বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, বিপ্লবীরা ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে পারে নাই। গভর্ণমেণ্ট দমননীতি দ্বারা বিপ্লব আন্দোলন দমন করিয়াছে, বিপ্লবীরা এখন জেলে আবদ্ধ, দেশের মধ্যে দেখা দিয়াছে নৈরাশ্য-ভয়-অবসাদ, এমন সময় মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে নূতন আলোর সন্ধান দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন অহিংস অ-সহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনে বিপদের আশঙ্কা কম। মানুষ সাধারণতঃ নিরাপদ পথেই চলিতে চায়, যে পথে বিপদের সম্ভাবনা আছে সেই পথে চলিতে চায় না। বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে—কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে প্রতি-পদে বিপদ, মৃত্যুর সম্ভাবনাই অধিক। অহিংস মতবাদের সহিত ধর্ম ও মানবতার সম্বন্ধ থাকায় ধর্মভীরু ভারতবাসীর মন সহজেই এদিকে আকৃষ্ট হইল। অপর দিকে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ও স্বদেশী নেতাদের প্রচারের ফলে বিপ্লববাদ বা হিংসানীতি অতি নিন্দনীয় বলিয়া প্রমাণ হইল।

বৈপ্লবিক নেতৃত্বের পতনের কারণ বিপ্লবীদের অ-সফলতা এবং মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের নূতন মতবাদসহ কর্মক্ষেত্রে আগমণ। বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় দেশের জনসাধারণ মহাত্মার নূতন আন্দোলনে মাতিয়া উঠিল। কোন কাজ একবার ব্যর্থ হইলে তাহাতে লোকের আকর্ষণ বা বিশ্বাস থাকে না, তাহার পুনরাবৃত্তি আর চলে না। তখন লোকের সম্মুখে নূতন কিছু ধরিতে হয়। নূতনত্বের একটা মোহ থাকে। বিপ্লবী নেতারা বহু বৎসর পর জেল হইতে মুক্ত হইয়া ঘর গুছাইতে ব্যস্ত ছিল, তাহারা লোকের চোখের সামনে চমকপ্রদ কিছু ধরিতে পারে নাই, জাতীয় কংগ্রেস তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাতীয় কংগ্রেস নূতন আন্দোলন সুরু করিল। নূতন আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতা কারাবরণ করিলেন, ইহাতে দেশের জনসাধারণ মুগ্ধ হইয়া

পড়িল। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিপ্লবীদের হাত হইতে জাতীয় কংগ্রেসের হাতে চলিয়া গেল। তখনও জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করে নাই।

বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, ইহার কারণ এই নয় যে বিপ্লবীরা কপট ছিল। বিপ্লবীরা ফাঁসি, দ্বীপান্তর দণ্ডের মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছে তাহারা কপট ছিল না, ভীরু ছিল না। বিপ্লবীদিগকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে। তাহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, বয়সও কম ছিল। বিপ্লবীদিগকে পলাতক অবস্থায় কাজ করিতে হইয়াছে, পুলিশ সর্বদা তাহাদের অনুসন্ধানে ছিল, সরকার তাহাদিগকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিত। তাহারা বেশী দিন কাজ করার সুযোগ পাইত না, তাহারা ধৃত হইত ও তাহাদের সুদীর্ঘ কারাদণ্ড হইত। অভিজ্ঞ লোকের স্থান নূতন লোক পূরণ করিত, আবার তাহারাও অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই ধৃত হইত। তাহাদের ভুল ত্রুটি যে ছিল না তা নয়, তাহারা ভুল করিয়াছে, কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভুল ত্রুটির সংশোধনও করিয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যে তাহারা বিদেশ হইতে জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছে, দেশী সৈন্যদিগকে নিজ দলভুক্ত করিয়াছে ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়াছে। অবশ্যই দলের লোকই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বিপ্লব ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নাই—ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহাই সফলতার দিকে লইয়া যাইবে। বিফলতার মধ্যেই সফলতার বীজ থাকে।

বিপ্লব সফল হয় নাই কিন্তু বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বিপ্লবীরা জানিত দেশের জনশক্তিকে সচেতন করিতে না পারিলে দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধ তাহাদের নিকট অ-প্রত্যাশিত ভাবে না আসিলেও খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছে এবং সুভাষবাবু যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়িয়াছেন তাহারাও সেই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাহির হইতে ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই কিন্তু তাহাদের বীরত্ব, ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ফলে দেশের মধ্যে জাগরণ আসিয়াছে, দেশকে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলার সময় আসিয়াছে। এ দিকে রুশ বিপ্লবের সফলতার ফলে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অনুশীলন সমিতির নেতাদের দৃষ্টিও সেই দিক এড়াইয়া যায় নাই। ১৯২০ সনে তাহারা মুক্ত হইয়া তাহাদের পূর্ব কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করিল এবং দেশকে নূতন ভাবে সংগঠন করার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী —

জেলে-ত্রিশ-বছর।